পারুল

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
এম. এ. বি. এল।

প্রাপ্তিস্থান।
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্।
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট:
কলিকাতা।

মূল্য দশ আনা মাত্র।

প্রকাশক—

শ্রীবিষ্ণুচরণ সেট বি, এ।

৮২ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট।

কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ—১৩৩৫

প্রিণ্টার—বি, সি, সেট বি, এ.

প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ৮২ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় আমার যে গল্পগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহারই কতকগুলি একত্র করিয়া সুধী বর্গের মনোরঞ্জনার্থ প্রকাশ করিলাম। গুন দোষ বিচারের ভার তাঁহাদের। হয়ত এগুলি কোন সময়েই প্রকাশিত হইত না, যদি শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রথম চৌধুরী এম, এ, ব্যার্, এ্যাট্, ল, মহাশয় গল্পগুলি পাঠ করিয়া প্রকাশযোগ্য বলিয়া উৎসাহিত না করিতেন। তিনি তাঁহার আশীর্বচন স্বরূপ ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমায় ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন।

গল্পগুলির ছায়া মাত্র আমি বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, আখ্যান অংশ যতদূর সম্ভব এই দেশীয় করিবার চেষ্টা পাইয়াছি, কিন্তু কতদূর সক্ষম হইয়াছি তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। যে উদ্দেশ্য লইয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম তাহার কথঞ্চিত সার্থক হইলেই আমার পরিশ্রম সফল হইবে।

"অর্চ্চনার" অন্যতম সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র মহাশয়ের যত্ন না থাকিলে "পারুল" কখনও ফুটিত কি না সন্দেহ। তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। মহিলা প্রেস, রেডিও সাপ্লাই ষ্টোর্স্ ও ইউনিভারস্যাল্ আর্ট গ্যালারীর অধ্যক্ষ মহাশয়গণ তাঁহাদের ব্লকগুলি ছাপিতে অনুমতি দিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, তাহারাও আমার ধন্যবাদের পাত্র। এই পুস্তক প্রণয়ণ ও মুদ্রাঙ্কণ ব্যাপারে যাঁহাদের নিকট আমি কিছুমাত্র সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদের সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বিশেষ যত্ন ও লক্ষ্য সত্ত্বেও কতকগুটী ছাপার ভুল রহিয়া গেল, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

জীবনের এই কুটিল ও বন্ধুর পথে যাঁহাদের দয়া আমায় পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে, আজ তাঁহাদের স্মরণে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সাদরে তাঁহাদের করে সমর্পিত হইল।

কলিকাতা।
বাসন্তী পূর্ণিমা।
১৩৩০

নিবেদন ইতি—
শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচয়-পত্র।

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাগ, বাঙ্গলার পাঠক সমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য, আমাকে অনুরোধ করেছেন। এর কারণ, আমি লেখক হিসাবে সে সমাজের নিকট অল্পবিস্তর পরিচিত এবং তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত। সকল সমাজেই নব আগন্তুকের পরিচয়, পরিচিতের মধ্যস্থতাতেই ঘটে থাকে। সুতরাং শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথের অনুরোধ রক্ষা করা আমি সঙ্গত মনে করি।

"পারুল" কতকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি পড়লেই বোঝা যায়, যে তাদের উপাদান বিদেশী সাহিত্য হতে সংগৃহীত। এবং বস্তুত ঘটনা যে তাই সে কথা লেখক তার পুস্তিকার মুখ-পত্রেও স্বীকার করেছেন। লেখকের মুখে এ রকম স্বীকারোক্তি শুনে মন খুসি হয়। যে লেখক এ কথা মুখফুটে বলতে সঙ্কুচিত হন তিনি হয়ত মনে করেন যে সাহিত্য জগতে আহরণ ও হরণ একই কথা। গল্পের উপাদান সাহিত্য থেকে সংগ্রহ করাতে লেখক তাঁর অক্ষমতার পরিচয় দেন না, কারণ গল্পের উপাদান লেখক মাত্রেই সংগ্রহ করেন, হয় জীবন থেকে, নয় সাহিত্য থেকে। রামায়ণ, মহাভারত ও বৃহৎকথা না থাকলে অর্ব্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্য জন্মলাভ করত না। পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্য থেকে যে শুধু এ দেশের লেখকেরা তাঁদের কথাবস্তু সংগ্রহ করেছেন, তা নয়, সকল দেশের সাহিত্যই পূর্ব্ব সাহিত্যের কাছে ঋণী। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে যখন শিক্ষিত সমাজ জীবনটাকে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে দেখতে ও বুঝতে অভ্যস্ত তখন কেবলমাত্র নিত্যজীবন থেকে কথাবস্তু সংগ্রহ করা বেশির ভাগ লেখকের পক্ষে সহজও নয় স্বাভাবিকও নয়। এ যুগে

যদি আমরা এমন লেখকের সাক্ষাৎ লাভ করি, যিনি মানবজীবনকে নিজের চোখ দিয়ে দেখতে এবং আমাদের স্পষ্ট করে দেখাতে পারেন, যথা টলষ্টয়, তাহলে তাঁকে আমরা অসাধারণ সত্যদ্রষ্টা বলে মানতে বাধ্য কিন্তু সকল সাহিত্যিকই ত আর দিব্যদৃষ্টির দাবী করেন না, ও করতে পারেন না।

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ স্বদেশী সাহিত্য থেকে নয়, বিদেশী সাহিত্য থেকে, তাঁর গল্পের কথাবস্তু সংগ্রহ করেছেন; কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে স্বদেশী সাহিত্যের প্রভেদ শুধু, উভয়ের সাজ সরঞ্জামে, এককথায় তাদের বাহ্যরূপে, অন্তরের ধর্ম্মে নয়। রচনা যে গুণে সাহিত্য হয়, সে গুণ কোনও দেশকালে আবদ্ধ নয়। অমরেন্দ্র নাথ যে সকল লেখকের কল্পনা আত্মসাৎ করেছেন, যথা Maupassant, Gorkey, Strindberg প্রভৃতি, তাঁরা যদি কেবলমাত্র স্বদেশী সাহিত্যিক হতেন, তাহ'লে ফ্রান্স, রুসিয়া, ও সুইডেনের বাইরে তাঁদের কথা নিরর্থক বলে গণ্য হত। তা যে হয়নি, তা সকলেই জানেন; সুতরাং বিদেশী সাহিত্যের মূল্য এদেশেও থাকতে বাধ্য।

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ স্পষ্টই বলেছেন যে তিনি বিদেশী কথাবস্তু স্বদেশী সাহিত্যে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করেছেন। এ উদ্যম যে প্রশংসার্হ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই গল্পগুলি তাঁর হাতে নব কলেবর লাভ করেও তাদের প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছে কি না, তার বিচারক সহৃদয় পাঠক সমাজ। এই কারণেই আমি এই নবীন লেখককে তাঁর "পারুল" পাঠক সমাজের হাতে তুলে দিতে অনুরোধ করি।

২০ মে কমার।
বালিগঞ্জ। } শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বিজ্ঞাপনী।

১। পারুল।

(*Maxim Gorkey*)

২। পাঁচ বিঘা ভুঁই।

(*Wlayds law St. Reymont*)

৩। আগন্তুকের আগমনে।

(*August Strindbarg*)

৪। প্রতিক্ষমানা।

(*Anton Tchekor*)

৫। হারাণ দিনের ব্যাথায়।

(*Gue de Maupassant*)

৬। স্বাধীনতার মূল্য।

(*Ambrose Birce*)

৭। যৌবনের ভাঁটায়।

(*Gue de Maupassant*)

চিত্র সূচী ।

পারুল।

আমরা ছিলুম ছাব্বিশ জন, ছাব্বিশটী জীবন্ত কল। সদর রাস্তার ধারে যে দু'তলা ভাঙ্গা পুরাণো বাড়ীটা ছিল, তার একতলার এক-ধারে ছিল একটা রুটীর কারখানা। সেই কারখানার কারিগর ছিলাম আমরা ছাব্বিশ জন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই স্যাঁতসেতে ঘরের মধ্যে ময়দা ঠেশা আর রুটী সেঁকার কাজ সবই কর্ত্তে হত আমাদের এই ছাব্বিশ জনকে। আমাদের কারখানা-বাড়ীর একতলাটা রাস্তা থেকে প্রায় হাতখানেক নীচু, আর সে ঘরের জানালা যে দুটী ছিল, সেগুলিও প্রায় ছাদের কাছাকাছি, সেগুলার ফাঁক দিয়েই যা একটু আলো বাতাস ঘরের মধ্যে আস্‌ত; কিন্তু প্রায় সব সময় ঘরটা শুকনো ময়দার গুঁড়ায় একরকম অন্ধকার হয়ে থাক্‌ত। জানালার

গরাদেগুলা ছিল লোহার ডাণ্ডার ; সেগুলা মনিবমহাশয়ই লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ভয় ছিল পাছে আমরা ঐ জানালার ফাঁক দিয়ে রাস্তার ভিখারীগুলাকে বা আমাদের মত হতভাগারা, যাদের অদৃষ্টে প্রায় কোনও দিনই কোন কাজ কর্ম্ম জুটে না, তাদের তাঁর রুটিগুলা বিলিয়ে দিই, যদিও কখনও আমরা তা করিনি তবুও তাঁর সন্দেহ ছিল আমরা সব চুরি কচ্চি আর সেই জন্য যখন তখন আমাদের 'চোর' 'হারাম-জাদা' প্রভৃতি তাঁর সুমধুর আপ্যায়ন হজম করে দিনের পর দিন সেই ঠাণ্ডা কনকনে ঘরে আবর্জ্জনা আর ধুলার মধ্যে কাজ করে যেতে হত।

আমাদের খাওয়া ও শোওয়ার কাজটাও আমরা ঐ ঘরের মধ্যেই সারতুম, মনিব মহাশয়ের কড়া হুকুম ছিল যেন খাওয়ার ছুতা করে হাওয়া খেতে বেরিয়ে না যাই, তাতে তাঁর সময়ের ও কাজের ক্ষতি হ'বে, ওকাজটা আমাদের কারখানা ঘরের মধ্যেই সারতে হবে। আর শোবার জন্য আলাদা ঘর ভাড়া করার মত পয়সা আমাদের কারুরই ছিল না। ভোর পাঁচটার সময় সর্দ্দার এসে আমাদের বিছানা থেকে উঠিয়ে দিত, আর ছটার মধ্যেই আমরা যে যার কাজে লেগে যেতুম। ঘুম তখনও সম্পূর্ণ চোখ থেকে ছাড়ত না, হাতগুলাও গতদিনের খাটুনিতে অবশ হয়ে থাকৃত, কিন্তু সর্দ্দারের হুকুমে আমরা বড় বড় গামলা টেনে নিয়ে ময়দা ঠেস্‌তে সুরু করে দিতাম।

রাক্ষসের মত প্রকাণ্ড উনানটা ভোর ছটায় সেই যে জ্বলতে আরম্ভ কত্ত, রাত দশটার আগে কোন দিনই নিব্‌ত না, বদ্ধ ঘরের ভিতর আগুনের ঝল্‌কা আমাদের উপর দিয়ে উপহাসের হাঁসি হেঁসে যেত, আর আমাদের মুখগুলোতে যেন লজ্জার লাল দাগের ছাপ দিয়ে যেত। আমরা

তার সেই জ্বলন্ত চোখ দুটোর সামনে সমানে খেটে যেতুম সেই রাত দশটা পর্য্যন্ত ; এরই মধ্যে সময় করে স্নানাদি সেরে যার যার নিজের ফুরসৎ মত পেটটা ভরিয়ে নিতে হত, খাবারের জন্য বিশেষ কোনও ছুটী আমাদের ছিল না। হোটেলের চাকরটা আমাদের ছাব্বিশ জনের জন্যে ছাব্বিশখানা সান্‌কীতে ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে যেত। আমরা নিজেদের অবসর মত হাত থেকে ময়দা ধুয়ে চট্‌পট্ খাওয়া সেরে নিতাম, কেউ কারও জন্যে অপেক্ষা কর্ত্তাম না, আর তার অবসরও পেতাম না, কারণ আমাদের কাজের পাঁজিতে অবসর রাত দশটার আগে বোধ হয় বিধাতা পুরুষ লিখতে ভুলে গিয়েছিলেন।

জমান পয়সা আমরা দেখেছি কিনা সন্দেহ। সমস্ত সপ্তাহের মজুরী পেতাম শনিবার, হোটেলওয়ালার প্রাপ্য কেটে নিয়ে আমাদের বাকিটা দিয়ে দেওয়া হত, সেটা প্রায় ৩।৪ টাকার মত। যেদিন টাকা হাতে আসত সেই দিনই কাবুলিওয়ালাগুলা দেখা দিত, ঐ ৩।৪ টাকার মধ্যে তারা সুদ হিসাবে যা আদায় কর্ত্ত, তা'দিয়ে হাতে প্রায় কিছুই থাকত না, এর উপর মাঝে মাঝে আমাদের তাড়ির খরচ তো ছিলই ; সেজন্য কাপড় কিনবার পয়সাও আমাদের জুটত না। বছরে হয়ত দুখানা কাপড় কিনতাম্ তাই দিয়ে লজ্জা নিবারণ না হলেও, লজ্জা নিবারণের চেষ্টা কর্ত্তাম ; ছেঁড়া নোংরা নেকড়ার টুকরাই ছিল আমাদের লজ্জা বস্ত্র।

আমাদের এই ছাব্বিশ জনের নাড়ী নক্ষত্রের খবর আমরা ছাব্বিশ জনেই বেশ জানতাম। আমাদের এই ছোট্ট ঘরের মধ্যে আমাদের যে রাজত্ব ছিল, তার বিশেষ নিয়ম এই ছিল যে আমাদের জীবনের কোনও ঘটনা আমাদের দলের লোকের নিকট গুপ্ত থাকবে না। নূতন কেউ এলেই

আমার একটী একটী করে তার সমস্ত খবরই জেনে নিতাম এবং আমাদের সকলের খবরই তাকে জানিয়ে দিতাম আমরা নিজেরাই। আমাদের মধ্যে পরস্পরের কাছে কিছু লুকানো থাকতো না, কারণ যদিও গুণতিতে আমরা ছিলাম ছাব্বিশ জন, কিন্তু মোটের উপর আমাদের সকলকে জড়িয়ে একজন ধরলেও কোনও ভুল হত না। দেহ আলাদা আলাদা ছাব্বিশটা থাকলেও আমাদের মন ছিল মোটে একটী, সেজন্য আমাদের একজনের মনের খবর অপরের পেতে দেরী লাগত না; এমনকি মনে হত একজনের মাথা ধরলে অপর পঁচিশ জনের মাথা ও সঙ্গে সঙ্গে টিপ্ টিপ্ কচ্ছে।

গল্প জমাবার মত বিশেষ কিছু পুঁজি আমাদের ছিল না, কারণ সব কইবার বা বলবার কথাই আমরা ইতিমধ্যে বলে কয়ে শেষ করে ফেলেছিলাম; সেই জন্য বেশীরভাগ সময়েই আমরা চুপ করে থাকৃতাম, কেবল মাঝে মাঝে নিজেদের নিয়েই নিজেরা একটু হাসি ঠাট্টা করে নিজেদের একটু চাঙ্গা করে রাখতাম। আমাদের এই একঘেয়ে কাজ আমাদের একেবারে পিষে রক্ত শুষে খেয়ে ফেলেছিল। কথাবার্ত্তার পুঁজি হারিয়ে আমরা যে কি বিপদেই পড়ে ছিলাম, তা আমাদেরই মত ভুক্তভোগী, যাঁরা একসঙ্গে বসে থাকেন কিন্তু সাড়া দেবার মতও কিছু খুঁজে পান না কারণ তাঁদের সব কথাই হয় ইতিপূর্ব্বে বলা হয়ে গেছে, না হয় বলবার মত কিছুই পুঁজি নাই, তাঁরাই জানেন। বসে থাকাটাও যখন বিরক্তি আনবার চেষ্টা কর্ত্ত, তখন ঘরের মধ্যে পায়চারী ক'রে বাইরে বেড়াবার সখটা মিটিয়ে নিতাম।

মাঝে মাঝে আমরা গান কর্ত্তাম। গান কর্ত্তাম শুনলে অনেকেই হয়ত চমকে উঠবেন, আর প্রথম দিনত আমরা নিজেরাই খুব

কম চমকে উঠি নি—আমরাও তা হলে গান কর্ত্তে পারি! পারি কি না পারি জানি না, তবে প্রায়ই আমরা গান গাই; আমাদের গান হয় সমবেত কণ্ঠে অর্থাৎ যার গলায় যত জোর আছে তত জোরে, আর একসঙ্গে। সুর, তাল, লয়ের আমরা কোন ধারই ধার্ত্তাম না; গান গাওয়ার আনন্দেই বলুন, আর যাই বলুন, গানের জন্যেই আমরা গান গাইতাম। আমাদের গান সেই বদ্ধ ঘরের মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠত, উঁচু পাঁচিলের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ঘরের ভিতরেই গম গম কর্ত্ত; সেটা হাসির রেশ, কি কান্নার প্রতিধ্বনি, তা কে জানে?

এই গান আরম্ভ হবার ইতিহাসটা একটু মজার. একদিন আমাদের একটী ছোকরা মেজাজটা তার সেদিন ভাল ছিল না, ঘরের এক কোণে রুটী সাজাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছিল, সেটা কর্ম্মের ক্লান্তিতে না অদৃষ্টের তাড়নায়, তা ঠিক জানা যাচ্ছিল না—হঠাৎ একটা সুর আমাদের কাণে গেল—ছোকরা গান গাইছে। আমাদের ঘরে গান! আমরা সব আশ্চর্য্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, সে কিন্তু কোনও দিকে না তাকিয়ে নিজের মনে গান গেয়ে যেতে লাগল; প্রথমে গুন্ গুন্ করে, তারপর একটু জোরে, শেষে গলা ছেড়েই গাইতে লাগ্‌ল। সুরটা কি করুণ! আমরা চুপ করে তার গান শুন্‌তে লাগলাম,—সে ছেলেবেলায় বেশ ভালই গান গাইতে পারত গলাটা এখনও বেশ আছে, তবে অত্যাচারে চেপে গেছে।

সেদিন অনেকক্ষণ সে গান কর্লে, কোনও দিকে তার দৃষ্টি ছিল না, হাতে মাখান পাতলা ময়দার ঢেলাগুলা শুকিয়ে জমাট বেঁধে গেল; হাতের কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল, গানে সে একেবারে ডুবে গিয়েছিল। আমরাও

এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে আমাদেরও হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এক অজানা ভাবনার স্রোতে আমরা ভেসে যাচ্ছিলাম, সে স্রোত থেকে যখন ফিরলাম, তখন তার গান থেমে গেছে। বাঃ, বেশ তো, এতে আর কিছু হোক না হোক্ আমাদের অবস্থাটা কিছুক্ষণের জন্যেও ভুলিয়ে রাখে।

সেই থেকে আমরা ঠিক করলাম আমরা গান কর্ব্ব; প্রথমে একজন সুর ধর্ত্ত, তারপর একজন যোগ দিত, ক্রমে আরও দু একজন যোগ দিত, শেষে ছাব্বিশ জনই এক সঙ্গে চেঁচাতে শুরু কর্ত্তাম।

সর্দ্দারের কাণে যেতেই সেদিন সর্দ্দার ছুটে এল, ব্যাপার কি? কারখানার মধ্যে এত গোলমাল কিসের? এসে দেখে আমরা গান কর্চ্ছি, সবায়েরই হাতের কাজ বন্ধ, "থাম, থাম" বলে সে যতই চিৎকার করে, আমাদের গলার জোরও ততই বাড়তে থাকে, হতাশ হয়ে সে চলে গেল মানব মহাশয়ের কাছে নালিশ কর্ত্তে। কিন্তু আমরা তা গ্রাহ্যও কল্লাম না।

সেই থেকে আমাদের গানও সজোরে রীতিমত ভাবে চলতে লাগল। সর্দ্দারও আর কিছু বলত না। এই ছিল আমাদের নিঃসঙ্গ, নিঃসম্পর্ক, ছোট্ট ঘরের মধ্যে বন্দী জীবনের একটুখানি প্রমোদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গান ছাড়া আর যে একটা জিনিষ আমাদের বড়ই প্রিয় ছিল, সে পারুল। যে বাড়ীতে আমাদের কারখানা ছিল, তার দোতলায় কয়েক ঘর ভাড়াটিয়া ছিল। এই সব ভাড়াটিয়াদের সকলেই যে বিবাহিতা স্ত্রী নিয়ে সংসার পেতেছিল তা নয়, এর মধ্যে অনেকেই এমন কতকগুলি নারীকে সংসারযাত্রার সঙ্গিনী করেছিল যারা আদৌ তাদের বিবাহিতা নয়। তাদের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না, অনেকেই দিন মজুরী হিসাবে সামান্য যা কিছু পেত, তার দ্বারাই সংসার চালাত। 'অভাব' ছিল এদের সঙ্গের সাথীর মত, এবং সঙ্গে সঙ্গে অভাবের যে যে দোষ, সেগুলাও এদের মধ্যে বেশ দেখা যেত। ঝগড়া, গালাগালি, গোলমাল, মারপিট, এসব এদের মধ্যে নিত্যই লেগে থাকত। অর্থের অভাবে ও শিক্ষার অভাবে এরা ক্রমশই নীচের দিকে নেমে আসছিল; আর এই নামাটা এত দ্রুত হচ্ছিল যে অতি শীঘ্রই এদের পূর্ব্বের পরিচয় লোপ পাচ্ছিল।

পারুল এই রকমই এক ঘরের মেয়ে, তার বাবা ও মায়ের ভিতর কোন বিবাহের সম্বন্ধ না থাকলেও তারা গৃহস্থ ভাবেই বাস করত। বয়স তার তের চৌদ্দর কাছাকাছি। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম, ঢল ঢলে কমনীয় মুখখানিতে তার ভাসা ভাসা চোখ দুটি বড়ই সুন্দর দেখাত, মোটের উপর পারুল ছিল সুন্দরী। সে ক্রিষ্টানদের ফ্রি স্কুলে পড়ত আর অবসর সময়ে

মায়ের কাজের কিছু কিছু সাহায্য করত। তার মার পূর্ব্বে পানের দোকান ছিল, তারপর হরিপদর সঙ্গে আলাপ হলে, সে তাকে এই বাড়ীতে আনে, সেটা পারুলের দাদার জন্মের পূর্ব্বে। পারুল হরিপদকেই বাবা বলত।

রোজ স্কুলে যাবার সময় সে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলত "কই গো, আমার বিস্কুট, স্কুলের ঝি এসেছে যে।" তার জন্য কিছু কিছু বিস্কুট আমরা সকলেই তুলে রাখতাম, সেগুলো তাড়াতাড়ি তার হাতে গুঁজে দিতাম। তার ছোট্ট হাত আমাদের উপহারে ভরে উঠত। স্কুল থেকে ফিরবার সময়ও তার পাওনা আদায় করে তারপর উপরে যেত।

এটা ছিল তার নিত্য বরাদ্দের মধ্যেই, সর্দ্দার সবই জানতো, কিন্তু কিছু বলত না। এমন কি মনিব মশায়কেও এ বিষয় কিছুই জানাতো না; তবে মাঝে মাঝে পারুলকে কপট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে ধমক দিত, তার সেই পাকা গোঁপ জোড়া আর কাল কুচকুচে মুখভরা বড় বড় দাড়ি পারুলের কাছে একটা বীভৎস ব্যাপার ছিল। সর্দ্দারকে ভয় না করলেও তার সেই প্রকাণ্ড চেহারাকে পারুল ভয় কর্ত্ত, তাকে দেখতে পেলেই "রাবণ রাজার নাত আসছেন" বলেই সে পালাত।

আমরা এই ছাব্বিশ জন, অন্ধকূপের অধিবাসীরা পারুলের এই দুবার আগমনের প্রতীক্ষায় বাকী সময়টা কাটাতাম। সে ছিল আমাদের এই অন্ধকার জীবনের মাঝে ক্ষণিকের চাঁদের আলো, আমাদের এই একঘেয়ে জীবন ধারার মধ্যে একটু নূতন, একটু মিঠে,

দমকা হাওয়া। তার সঙ্গে দুটো কথা কওয়ার জন্যই যেন আমাদের সব কথা জমা হয়ে থাকৃত, সে এলেই তার সঙ্গে নানারকম কথা কইতে সুরু করে দিতাম আমরা সবাই—সে কোন কথার জবাব দিত, কোনও কথার জবাব দিত না; কোনও কথায় একটু হেঁসে তার ছোট্ট ঘাড়টা হেলিয়ে দিত, আমরা তাতেই খুসী হয়ে যেতাম। যদি কেউ তাকে বল্‌ত "এইবার পালা, সর্দ্দার ধরবে, বিস্কুট নর্তে এসেছিস্।" সে ঘাড় বাঁকিয়ে বলত, "ও দেড়ে হতভাগ্যটা আমার কি করবে?" বলেই টুক্ করে পালিয়ে যেত। সে ভাল করেই জান্‌ত মুখে যাই বলুক না কেন, সর্দ্দারও মনে মনে তাকে ভালবাসে। তারপর সে চলে গেলেই আমরা সবাই তারই কথা কইতে লাগতাম। কাল যা করেছি, সে কথাই আজ ফের বলতাম; তার আগের দিনও সেই কথা হয়েছিল, আগামী কালও সেই কথা হবে. রোজই আমরা একই কথা কয়ে আসছি, আসবও—সে কথা কখনও পুরাণো হয় না, রোজই সেটা সরস নুতন, কারণ সে কথা পারুলের।

আমাদের জীবনের মধ্যে পরিবর্ত্তন বলে কোনও জিনিষ ছিল না; আর ত' কখনও হবেও কি না জান্তাম না, আমাদের এই একঘেয়ে জীবন আমাদের কাছেই ক্রমে দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছিল, এবং হয়ত আমরা আত্মহত্যা করতেও ভয় পেতাম না, যদি না আমাদের পারুল থাকতো।

স্ত্রীজাতির সহিত পরিচয় আমাদের কমই ছিল। আমাদের মধ্যে অনেকেই মা ছাড়া অন্য কোনও স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে এসেছে কি না সন্দেহ, অনেকে হয়ত নিজের মাকেও দেখে নি। তারপর যে সব স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আমরা এসেছিলাম, তারা সমাজের অতি নিম্নস্তরের, সে জন্য

তাদের সম্বন্ধে কোনও আলোচনা কল্লেই সেটা অতি কুৎসিৎ হত। কিন্তু এ নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল পারুল।

আমরা কখনও তার সঙ্গে অভদ্র ভাষায় কথা বলিনি; কখন তার সম্বন্ধে কুৎসিৎ ইঙ্গিত করিনি, এমন কি খোলাখুলিভাবে কখনও কোন ঠাট্টা কর্ত্তেও আমাদের সাহস হয়নি। হয়ত তার সঙ্গে আমাদের আলাপ খুব অল্পক্ষণের জন্য হত, সে সময়টা আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে তার প্রতি তাকিয়ে থাকতাম, তার সৌন্দর্য্যের নিকট সম্ভ্রমে যেন মাথাগুলো নুয়ে পড়ত, অন্য কিছু ভাববার অবসর হত না। আমরা বোধ হয় তাকে ভালই বাসিতাম।

হাঁ, আমরা তাকে ভালবাসতাম, পুরুষ যেমন নারীকে ভালবাসে। আমাদের এই ছাব্বিশ জনেই পারুলকে নিজের মনে করে সেই রকমই ভালবাসতাম। এতগুলো লোক কি করে একটা নারীকে ভালবাস্‌তে পারে বা তার কাছে ভালবাসার দাবী করতে পারে, এই বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন ছিল না। আমাদের জীবনের মধ্যে প্রকাণ্ড যে একটা অভাব ছিল, আমরা সেটা পারুলকে দিয়ে ভরিয়ে রাখ্‌তে চেয়েছিলাম। ভালবাসা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না, আমাদেরও বেঁচে থাকবার জন্য ভালবাসার দরকার হয়ে পড়েছিল। তাই আমাদের এই ছাব্বিশ জনের ভালবাসা এক পারুলকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠছিল, এর জন্য কেউ কাকেও হিংসা করতাম না। পরস্পরের ভালবাসা নিয়ে কেউ ঈর্ষা বা ঝগড়া কর্ত্তাম না; কারণ আমরা জানতাম আমাদের সকলেরই পারুলকে ভালবাসার অধিকার আছে। কিন্তু কেন? এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনদিন কোনও তর্ক

হয় নি বরং কে বেশী ভালবাসা দেখাতে পারে তাই নিয়ে আমাদের মধ্যে রেশারেশী চল্‌ত।

সেদিন আমাদের নারাণ, তার ছেঁড়া ফতুয়াটি সেরে দেওয়ার জন্যে পারুলকে বল্লে। সে কিন্তু বেশ গম্ভীর ভাবে জবাব দিলে "তারপর"—বলেই ঘাড় ফিরিয়ে চলে গেল। আমরা তাকে এই নিয়ে ঠাট্টা সুরু কর্ত্তেই, সে বল্‌লে "কি তোমরা একটা বেশ্যার মেয়েকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ী কর বলত?" ব্যস্‌, এই পর্য্যন্ত, এর বেশী তাকে আর কিছু বলতে আমরা দিলুম না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমাদের বাড়ীটার অপরাংশে একটী কোতামের কারখানা ছিল। তার অধিকারীও ছিলেন আমাদের মনিব মহাশয়। সে কারখানার লোক গুলার মাহিনা আমাদের চেয়ে বেশী কিন্তু খাটুনি আমাদের চেয়ে ঢের কম। খাওয়া ও পোষাক তাদের আমাদের চেয়ে ঢের ভাল। তারা আমাদের রুটী-সেঁকা কাজকে খুবই ছোট কাজ মনে কর্ত্ত এবং এই জন্য কখনও আমাদের সঙ্গে মিশ্‌তে আস্‌ত না। আমরাও কখনও তাদের চৌকাট মাড়াই নি।

একদিন শুন্‌লাম তাদের বড় মিস্ত্রী মদ খেয়ে কামাই করায় তার কাজ গেছে, তার জায়গায় নূতন যে এসেছে, সে বয়সে ছোক্‌রা, বেশ বাবু, খুব চটপটে।

আমরা তার চেহারা দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু তার কাছে এগোবার মত সাহস আমাদের হচ্ছিল না। একদিন হঠাৎ সে নিজেই আমাদের ঘরে হাজির হল। এক লাথিতে ভেজান দরজাটা খুলে, চৌকাটের উপর দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "ভাই সব, নমস্কার।"

সোজা ভাবে সে দাঁড়িয়ে রইল; হ্যাঁ, বেশ লম্বা চওড়া চেহারা তার এটা স্বীকার কর্ত্তেই হবে, কাপড় বেশ কুঁচিয়ে পরা, গায়ের পাঞ্জাবিটা কম দামের হোলেও বেশ ধোপ-দস্ত ও গিলে করা, জামার ভিতর থেকে লাল রংয়ের গেঞ্জিটা বেশ দেখা যাচ্ছিল, মাথার টেরিটা খুব পরিপাটীর

সঙ্গে থাকে থাকে সাজান, অল্প গোঁপ যা ছিল, তাও দুদিক কামিয়ে ঠিক ঠোঁটের উপর একটা গোছা মাত্র। পায়ে চক্ চকে পম্পস্থ, হাতে একগাছা মোটা লাঠি নিয়ে বিশাল দেহখানি সমেত ঘরের দিকে এগিয়ে আস্তে লাগ্ল।

ঘরে ঢুকে সটান একটা টুল টেনে নিয়ে সে বসে পড়ল, যেন কত দিনকার চেনা। বসেই সে আমাদের সঙ্গে আলাপ সুরু করে দিলে। প্রথমেই সে জিজ্ঞাসা কল্লে মনিবের কথা, সে কেমন লোক ইত্যাদি। আমরা সকলেই একসঙ্গে বলে উঠলাম, "আরে ম'শায়, সে একটা চামার! কসাই, কঞ্জুস্! প্রকাণ্ড রকমের পাজী, তার কথা আর বলবেন না।" ইত্যাদি ইত্যাদি, মনিবের নামে যত কথা বলা যেতে পারে তার একটীও আমরা বাদ দিলাম না। সমস্তই সে শুনলে, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, "এখানে নাকি অনেক মেয়ে মানুষ থাকে?"

মেয়ে মানুষ থাকে—সে আবার কি? মুখে বল্লাম, "আজ্ঞে?"

সে বেশ জোর দিয়েই বল্লে, "বুঝতে পারছ না? এসেই শুনলাম; বাড়ীর এধারে নাকি কতকগুলি মেয়ে মানুষ থাকে; ঠিক ত?"

আমরা উত্তর দিলাম, "উপরে কয়েকটী পরিবার থাকে বটে।"

"পরিবার? কি রকম পরিবার হে? শুন্‌ছিলাম ত সব বেশ্যা।"

"আজ্ঞে, এক সময়ে তাই ছিল বটে; কিন্তু এখন সব সংসারী গৃহস্থ ভাবেই আছে।"

"হ্যাঁ, বেশ্যারা আবার সংসারী! শর্ম্মা ফণীরাম দাস; ওরকম অনেক শর্ম্মার হাতে তৈয়ারী হয়ে গেছে। যাকি, ওখানে তোমাদের কেউ আছে নাকি?"

"আজ্ঞে, আমরা ওসবের মধ্যে নেই।"

"তা দেখেই বুঝেছিলাম, ও সব কর্ত্তে হলে চাই বুকের পাটা, গায়ের ক্ষমতা, কব্জির জোর, চেহারায় খোলতাই।"

তারপর ফণী বলে যেতে লাগল, কেমন করে সে মেয়েগুলোকে বশ করে তাদের দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করিয়ে নিত ইত্যাদি।

খানিকক্ষণ পরে সে চলে গেলে আমরা তার সব কথাগুলা ভাবতে লাগলাম। তাকে আমাদের ভালই লাগছিল, কারণ এমন ভাবে কেউ ইতিপূর্ব্বে আমাদের সঙ্গে মেশেনি। কিন্তু লোকটা কি বিষম! একদম বলে কিনা সব ভাড়াটেদের পায়ে লুটিয়ে ফেলব—ওর মতলব কি? এ কি লোভ! এ কি ক্ষুধা না প্রবৃত্তির তাড়না?

রুটীওয়ালা হরিদাস বললে "কিন্তু হে, ও বেটা পারুলের পিছনে লাগবে না ত?"

পারুল? তাইত এতক্ষণ তার কথাটা মোটেই ভাবা হয় নি; তাই ত, যদি পারুলের কিছু হয়? মধুসূদন বললে, "না, না, পারুল সে রকম মেয়েই নয়।"

আমাদের মধ্যে নারাণই ছিল একটু পারুলের উপর নারাজ, সে ভেংচে বল্লে, "না! সেরকম মেয়ে মোটেই নয়! কিন্তু রক্তের টানটা যাবে কোথা?"

বিপিন একটু আমাদের মধ্যে ষণ্ডা গোছের, সে রুটী সেঁকার বড় হাতাটা ঘুরিয়ে বল্লে, "বেটাকে যদি পারুলের পিছনে ঘুরতে দেখি ত একই ঘায়েই ব্যস্, বেটার সব শেষ করে দেব।"

তারপর নানারকম তর্কবিতর্কের পর আমাদের ঠিক হল, আমরা কাউকে কিছু বলব না, ফনী কি করে দেখা যাক্, কিন্তু পারুলের চাল চলনের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তারপর চার সপ্তাহ কেটে গেছে, এর মধ্যে ফণী আমাদের ঘরে প্রায়ই এসেছে। এই সময়টুকুর মধ্যেই সে দোতলার প্রায় সব মেয়েদের সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিয়েছে, প্রায়ই দেখা যেত সে কোন একটা মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প কচ্ছে। কিন্তু তাদের বিষয় আমাদের কাছে কিছু বল্‌ত না।

পারুলও আগের মত রোজই রুটী বিস্কুট নিতে আসত এবং আমাদের সঙ্গে আগেকার মতই হাসত, স্ফুর্ত্তি কর্ত্ত, গল্প কর্ত্ত। মাঝে মাঝে আমরা তাকে ফণীর কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তাম, তাতে সে উত্তর দিত, "ঐ ছুঁচো-মুখো ড্যাবরা চোখো ছোঁড়াটা, আহা যেন নব কার্ত্তিকটা।" এই রকম নানারকম ঠাট্টা কর্ত্ত। আমরাও ফণীর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলাম। পারুল যে অন্য মেয়েদের মত ফণীর দিকে ঢলে পড়েনি দেখে বেশ গর্ব্ব অনুভব কর্ত্তাম। এরপর থেকে পারুল আমাদের কাছে আরও বেশী প্রিয় হয়ে উঠল।

একদিন ফণী আমাদের ঘরে ঢুকে পড়ল; চোখ মুখ তার বেশ লাল টকটকে হয়ে উঠেছে; কোথা থেকে মদ খেয়ে এসেছে। সে একটা টুলের উপর বসে হাঁসতে আরম্ভ করে দিলে, "হা, হা, হা, ভারি মজা হয়েছে আজ, আমার জন্য দু বেটী মেড়ার লড়াই লাগিয়ে দিয়েছে; স্বর্ণর মার স্বর্ণ আর পশ্চিম দিকের ঘরের মনোরমা। দেখগে যাও দুজনের কি গালাগালির চোট, শেষকালে স্বর্ণ গিয়ে মনোরমার চুলের ঝুটী ধরে

টানছে আর মনোরমা ষাঁড়ের মত চ্যাচাচ্ছে আর গালাগালি দিচ্ছে ; হা হা হা—" সে আপন মনে হেঁসে যেতে লাগল।

রুটীওয়ালা হরিদাস বল্লে "ভারি তুটো ছ্যাবলা মেয়ের কথা জ্যাক করে বলা হচ্ছে। যদি আসলে ঘা দিতে পার, তবেই বুঝি বাহাদুরী।"

ফণীর হাসি থেমে গেল, সে জিজ্ঞাসা কর্লে "কি রকম ? কি রকম ?"

হরিদাস নিজেকে সামলে নিলে। পারুলের নামটা তার মুখে আসছিল, সেটাকে সে চাপা দিয়ে বল্লে "না, ও কিছু নয়, হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।"

ফণী বল্‌তে লাগ্‌ল "কি, বলবে না ? বলবে না ত ? আচ্ছা বেশ—হাঁ দেখ, তোমরা আমায় অপমান কচ্ছ, আচ্ছা, আমি এ অপমানের প্রতিশোধ নেবই ; তবে আমার নাম –হাঁ্যা—"এই বলে সে টল্‌তে টল্‌তে উঠবার চেষ্টা কর্লে, কিন্তু পার্লে না ফের সেই টুলের উপর বসে পড়ল—আর ক্রমাগত চেঁচাতে লাগল "বলবে না ত ? বলবে না ত ? আমায় তোমরা অপমান কচ্ছ—হাঁ্যা, খুবই অপমান কচ্ছ।"

হরিদাস কোনও জবাব না দিয়ে উনুনের ভিতর রুটী সেঁকতে দিতে লাগল। ফণী টল্‌তে টল্‌তে উনুনের ধারে গিয়ে দাঁড়াল, হরিদাসের হাতটা চেপে ধরে বল্‌লে "কে, তোমাকে বলতেই হবে ? কার কথা তুমি বলছ ? বলে ফেল তার নামটা।"

হরিদাস বিরক্ত হয়ে বল্লে "যার কথাই হক্ না, তোমার তাতে কি ? তুমি কি সবাইকেই জান ?"

"হাঁ্যা, হাঁ্যা, সবাইকেই আমি চিনি, নামটা বলই না ছাই।"

"শুনে তোমার লাভ ?"

"লাভ না হলেও লোকসান ত হবে না, আর লাভ যে হবেই না তাই বা কে তোমায় বল্লে ?"

হরিদাস কিছুক্ষণ ভাবতে লাগ্‌ল, পরে বল্লে, "দোতলার নন্দর একটা মেয়ে আছে জান ?"

"কে পারুল ?"

"সেই।"

"ও তাকে ঠিক কর্ত্তে হবে ?"

"পার ?"

"পাবি না ?"

"সে বড় কঠিন ঠাঁই।" বলে হরিদাস অবিশ্বাসের হাসি হেঁসে উঠ্‌ল।

"—হাঁ পারি—এক মাসের মধ্যেই পারি—অতদিনই বা কেন ? পনের দিনের মধ্যেই। বাজী, আচ্ছা, দশ টাকা।" বলে ফণী হরিদাসের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে।

"পার ত পার, এখন তুমি বেরোও।"

সে তার লম্বা কাঠের হাতাখানা সামনে নিয়ে যখন ফণীকে বেরিয়ে যেতে বল্লে তখন ফণী তার সেমূর্ত্তি দেখে তার সামনে থাকতে আর ভরসা কর্লে না, আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হারাণ বল্লে, "হরিদা, কাজটা কি ভাল কর্লে ?"

হরিদাস গোড়া থেকেই চটে ছিল, এখন আগুন হয়ে বল্লে "নে, নে, তুই তোর নিজের কাজ কর, অপরের কাজের ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ফণীকে দেখে মনে হতে লাগ্‌ল সে বেশ চটে রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে পারুলের জন্য ভয়ও হতে লাগল। "কিন্তু পারুল ফণীকে আমল দেবে কি না," এই সন্দেহে মনটা কেবল দুলে দুলে উঠছিল—নাঃ, পারুল কখনই তা হ'তে পারে না, ফণীর কোনই আশা নেই। পারুলের উপর বিশ্বাস আমাদের অগাধ, আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে পারুলের কাছে তার কোনও চালাকিই চল্‌বে না, কেউ কেউ আমাদের মধ্যে বলতে লাগ্‌ল ফণীকে আর একটু বাড়িয়ে দিলে ভাল হত।

সেদিন থেকে আমরাও কিছু কিছু বদ্‌লে গেলাম, আগে আমাদের কথা কইবার মত বিশেষ কিছুই থাকতো না, এখন আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এমনকি রাত্রিতে শুয়ে শুয়েও পারুলের কথাই কইতে লাগলাম। আমরা সয়তানের সঙ্গে খেলা সুরু করে দিয়েছিলাম তাই ভয়ে বুক মাঝে মাঝে কেঁপে উঠত, "কি হবে"। ফণী ও পারুলের সম্বন্ধে কোনও কিছু কানে গেলেই বুক্‌টা ধড়াশ্ করে উঠত, তাইত এ ভীষণ খেলার পরিণাম কি? পারুলের আলোচনায় আমারা এত উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলাম যে কাজে আর ক্লান্তি আসছিল না, সারা দেহের ভিতর দিয়ে এমন একটা সাড়া জেগে উঠছিল যে ক্লান্তি দেশ-ছাড়া হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে মনিব ম'শায়েরও ক্রটীর ঝুড়ির সংখ্যাটাও বেড়ে উঠছিল, কিন্তু সে দিকে নজর দেওয়ার ফুরসৎ আমাদের তখন ছিল না।

পারুলকে আমরা ফণীর সঙ্গে আমাদের কথার কিছুই বলিনি বা ফণীর বিষয় তাকে কিছুই জিজ্ঞাসাও করি নি। আমরা আগেকার মতই তার সঙ্গে স্নেহের ব্যবহার করে আসছিলাম, তবে আমাদের ছাব্বিশ জোড়া চোখ সর্ব্বদা তার পিছনে পিছনে ঘুরত।

হরিদাসের সঙ্গে কথা হওয়ার পর থেকেই ফণীর অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। আগেকার মত ছ্যাব্‌লাম তার আর দেখা যেত না; কারখানায় যখন আসত তখন তার পরণে থাকৃত খাকী প্যাণ্ট, খাকী মিলিটারী সার্ট এবং খাকী রংয়েরই একটা টুপী, বেশ গম্ভীর ভাবেই সে কাজকর্ম্ম দেখ্‌তে আরম্ভ করেছিল, আমাদের কারখানায় সে মোটেই আসত না বরং ডেকে পাঠালে বল্‌ত ফুরসৎ নাই, বড় কাজ।

আগের মতই বাড়ীর সব মেয়েরা উঠানের ধারে বেড়ায়, কিন্তু তখন সেখানে ফণীর দেখা কোনও দিনই তারা পায় না; কোন কোনও মেয়ে যদি বোতামের কারখানা ঘরের দিকে যেত, ফণী তাদের সঙ্গে কথা কইবার ভয়ে কারখানার কল-কব্জার ভিতর এমন ঢুকে পড়ত যে বেচারাদের নিতাৎ হতাশ হয়ে ফিরে আস্‌তে হ'ত; যেদিন দেখ্‌ত মেয়েদের মধ্যে কেউ দেখা করবার জন্য বাইরের উঠানের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, সে সটান্ বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেত।

আমরা সব দেখে ভাবতাম ফণীর হল কি? কিন্তু তখনও মনে মনে ভাবতাম ফণী বোধ হয় পারুলের কোন সন্ধান আজও পর্য্যন্ত পায়নি; আর যতদিন এগিয়ে যাচ্ছিল, ততই আমাদের উদ্বেগ কমে আসছিল,—ফণীর কথা তা হলে শুধু ফাঁকা আওয়াজ মাত্র।

পারুল বিকেলের দিকে রোজই প্রায় বাড়ীর সামনের পার্কে একটু

বেড়াতে যেত, এটা আমরা সবাই জানতাম, এবং কতকক্ষণ সে বাইরে থাকৃত তার খবরও আমরা পেতাম, কারণ তার যাতায়াতের পথ ছিল আমাদের ঘরের সামনে দিয়েই।

এ কদিন দেখ্ছিলাম তার ফিরতে যেন একটু দেরী হয়, কোনও কোন দিন সন্ধ্যার পরও সে বেড়িয়ে ফিরে, একদিন তার মা তাকে এই নিয়ে খুবই বকৃছিল ধমকাচ্ছিল, এত জোরে বকৃছিল যে আমাদের ঘর থেকেই তার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। পরদিন পারুল যখন বিস্কুট নিতে এল, তখন তাকে বকাবকির কারণ জিজ্ঞাসা কর্ত্তেই, সে বল্লে "ওসব কিছু নয়, মার অভ্যেস বকাবকি করা, তাই বাজে কথা নিয়ে বকতে সুরু করেছিল,"—বলতে বল্তেই সে তাড়াতাড়ি নেমে গেল, আমরা সবাই বুঝ্তে পার্ল্লাম যে সে একটা বিষয় আমাদের কাছে গোপন কর্চ্ছে এবং কথাটা চাপা দেওয়ার জন্যই এত তাড়াতাড়ি চলে গেল। কিন্তু ব্যাপারটা কি, মনটাকে বেশ ভাবিয়ে তুল্লে; নারাণ হঠাৎ বল্লে, "হরিদা, ফণীর এ বিষয়ে হাত নাই ত?"

আমরাও একটু চম্‌কে উঠ্লাম, তাইত ফণীর কিছু হাতে আছে নাকি এতে? কদিন ফণীও বড় বিকালের দিকে এদিকে আসে না, অন্য কোনও মেয়েদের সঙ্গেও তো সে বেড়ায় না, সেও ত কারখানা বন্ধ হলেই বেরিয়ে যায়। পারুলের সঙ্গে মিশ্তে নাকি? ভাবনাটা যেমন এ কদিনে কমে এসেছিল, তেমনি আজ হঠাৎ ভাবনার আর সীমা রইল না।

হরিদাস এতক্ষণ চুপ করে উনানের ধারে বসেছিল, একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বল্লে "আমিই বোধ হয় মেয়েটার সর্ব্বনাশ কর্ল্লাম"।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ক্রমে পনের দিনের শেষ দিন এসে পড়ল। আমরা সব চুপ্ করে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম কি হয়। আজ প্রমাণ হয়ে যাবে আমাদের ভালবাসা অপাত্রে পড়েনি, এই পনের দিন ফণী পারুলের পিছনে ঘুরছিল কি না সে খবর আমরা কিছুই পাচ্ছিলাম না, কিম্বা এসব নিয়ে আমরাও তাকে কিছু প্রশ্ন করিনি।

সেদিনও সকালে সে অভ্যাস মত জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বল্লে "আমার রুটী" তারপর ঘরের ভিতর ঢুক্‌ল, আমরা কোন জবাব না দিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, সে থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে, "কি হয়েছে আজ তোমাদের ?"

বিপিন জিজ্ঞাসা কল্লে, "তুমি—?"

সে বল্লে, "আমি ?"

বিপিন বল্লে, "বিশেষ কিছু নয়, তবে তুমি—"

সে ত্যক্ত স্বরে বল্লে "বাজে বকে সময় নষ্ট না করে শীগ্‌গীর দেবেত দাও, নয়ত আমি চল্লাম,—" এই বলে হঠাৎ পিছন ফিরে হন্ হন্ করে চলে গেল।

হরিদাস উনুনের দিকে চেয়ে বল্লে, "ঠিক্ হয়েছে, কিন্তু শেষে হতভাগা ফণে,—রাস্তায় কুকুরটা—!"

হরিদাসই ছিল আমাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বুদ্ধি বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ,

তার কথা শুনে আমরা বেশ দমে গেলুম, ফণীরই জীৎ! পারুল বিশ্বাসঘাতিনী !!

ঠিক্ বিকাল চারটা সাড়ে চারটার সময় ফণী এসে দেখা দিলে, বেশ ফিট্ ফাট্ বাবুটী, পোষাকের বিশেষ আড়ম্বর নেই বটে, কিন্তু বেশ পরিপাটী। আমাদের দিকে এসে সোজা তাকিয়ে রইল, আমাদেরও চাওনি যেন কেমনতর হয়ে গেল।

ফণী তা লক্ষ্য না করেই বল্লে, "কিহে আজ আমি তোমাদের দেখিয়ে দেব, ফণী কথায় যা বলে কাজেও তাই করে। আর ঘণ্টাখানেক পরে ছুটির পর ঐ বারান্দার পাশে দাঁড়িও, ঐ থামের ফাঁক দিয়ে তাকালেই সব দেখ্‌তে পাবে, আচ্ছা, আমি এখন চল্লুম।" সে কারখানা ঘরের দিকে চলে গেল।

সন্ধ্যার একটু আগেই আমরা সব বারান্দায় জমা হয়ে দাঁড়ালুম; দেখবার জন্যে ঠেলাঠেলি পড়ে গেল, যারা পিছনে পড়েছিল তারা যতদূর সম্ভব উঁচু হয়ে সামনের লোকদের কাঁধের উপর ভর দিয়ে দেখতে লাগল। অল্পক্ষণ পরেই উঠানের অপর ধারে পারুলের দেখা পাওয়া গেল। এদিক্ ওদিক্ চাইতে চাইতে সে আসছে; একটা থামের ও পাঁচিলের খানিকটা, আমাদের একেবারে আড়াল করে রেখেছিল। পারুল তাড়াতাড়ি এসে ময়দার গুদাম ঘরের পাশে ছোট খালি কুঠুরীটার ভিতর ঢুকে পড়ল্।

অল্প খানিকক্ষণ পরে ফণী তার কারখানার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল; তার চলন বেশ ধীর, যেন সে বেড়াতে বেরিয়েছে; তারপর কোনদিক না তাকিয়ে সেও সোজা গুদামের কুঠুরীর মধ্যে ঢুকে পড়ল।

আমরা বোধ হয় মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর ফণী ঘর থেকে

বেরিয়ে এল, ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে, মুখ দিয়ে একটা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে, যেমন সে রোজ বেরুত। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সেইখানেই সে পায়চারী কচ্ছে। তার কিছুক্ষণ পরে পারুলও বেরিয়ে এল, তার চোক্‌দুটো আনন্দে চক্ চক্ কচ্ছে, আর ঠোঁট দুটার পাশে চাপা হাসি খেলে বেড়াচ্ছে। চলনটা ঠিক সে রকম সোজা নয়, একটু যেন আবেশে টলে পড়্‌ছে।

আমরা আর থাক্‌তে পারলাম না, সবাই গিয়ে উঠানের মাঝখানে পারুলকে ঘিরে দাঁড়ালাম, এমনভাবে দাঁড়ালাম যে পারুলের যাবার কোনও পথ রইল না। তারপর আরম্ভ হল আমাদের ঠাট্টা আর টিট্‌কারী। আমাদের হঠাৎ আস্‌তে দেখে পারুল চমকে উঠ্‌ল এবং নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইল, আমরা তাকে চক্রাকারে ঘিরে ফেল্লাম; বাইরে যাওয়ার কোনও পথ নেই দেখে সে চুপ করে আমাদের ঠাট্টাগুলা শুনতে লাগল, শুধু এদিক ওদিক ঘাড় ফিরাতে লাগল, একটা জবাবও তার মুখ দিয়ে বেরুল না। ঠোঁট চেপে সে সব সহ্য করতে লাগ্‌ল মনে হল যেন তার ঠোঁট ফেটে রক্ত ছুটে বেরুবে। তার এই নিস্তব্ধতা আমাদের আরও ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল. আমাদের যত গালাগাল মনে আসতে লাগ্‌ল সবগুলাই তার উপর চালাতে লাগলাম; ক্রমেই আমাদের গলার স্বর এত চড়তে লাগ্‌ল যে উপরের বারান্দায় ও নীচে লোক জমে গেল।

তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠল, একটু আগে যে চোক্ আনন্দে ভরপুর ছিল সেগুলা জলে টল্ টল্ কর্ত্তে লাগল, যে বুকটা আনন্দে নাচ্‌ছিল, এখন সেটা উদ্বেগে ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গিয়ে চাপা কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিল।

কিন্তু সে দিকে আমাদের মোটেই লক্ষ্য ছিল না; আমরা তার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্ষেপে উঠেছিলাম—সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম যে একটী ছোট মেয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি আমরা ছাব্বিশ জন পুরুষ। কিন্তু আশ্চর্য্য, পারুল একটী কথাও বল্লে না; একটা ক্ষীণ প্রতিবাদও তার মুখ দিয়ে বেরুল না; শুধু তার চোখ দিয়ে টস্ টস করে জল পড়তে লাগল। হঠাৎ বিপিন গিয়ে তার আঁচলটা ধরে একটা টান্ দিলে।

চোখের জল তার মুহূর্ত্তের মধ্যে শুকিয়ে গিয়ে আগুন ঝল্‌সে উঠ্‌ল, ঠোঁট শক্ত হয়ে গেল; তারপর বিপিনের গালে এক চড় দিয়ে পারুল বল্লে,—"কুকুরের এত আস্পর্দ্ধা।" তার এই মহীয়সী মূর্ত্তী দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, সে সোজা আমাদের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্য এগিয়ে এল, আমরা আপনি সরে গিয়ে তার জন্য রাস্তা করে দিলাম, বাধা দেবার ক্ষমতা আমাদের আর ছিল না, পারুল সেই ফাঁকে বেরিয়ে চলে গেল।

আমরা ছাব্বিশ জন স্তব্ধ হয়ে উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর ধীরে ধীরে আমাদের বন্ধ খাঁচার মধ্যে ফিরে এলুম।

মাসখানেক পরে, শুনলাম ফণীর বিয়ে পারুলের সঙ্গে; বিয়ের দিন দুয়েক আগে, হরিপদ জানিয়ে গেল, এ বিয়েতে আমরা যেন সকলে আসি; ফণীও খবর পাঠালে আমাদের সকলেরই নিমন্ত্রণ—কিন্তু আমাদের যাবার কোনও মুখ ছিল না; সকলের ব্যগ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে পারুলের সেদিনের দীপ্ত মূর্ত্তি কেবলই এসে প্রকাণ্ড বাধার মত আমাদের সামনে ক্রমাগত দাঁড়াতে লাগল।

বিয়ের দিন আমরা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে তার ভিতরে, নিজেদের

কাজে এমন ভাবে

রেশ আমাদের কানের ভিতর কিছুতেই ঢুকতে না পারে।

তার পরদিন আমাদের ঘরেরই সামনে দিয়ে পারুল চলে গেল। যাবার সময় সে একবারও আমাদের ঘরের দিকে ফিরে তাকিয়ে ছিল কি না জানি না, বা জানবার জন্যে কেহই সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম না; পারুলের সামনে চোখোচোখি দাঁড়াবার ভরসা আমাদের আর মোটেই ছিল না।

এরপর অনেকবার এই বাড়ীতে সে এসেছে, আমাদের কারখানা ঘরের সামনে দিয়েই সে যাতায়াতও করেছে, কিন্তু আর কখনও সে আমাদের ঘরে ঢোকেনি।

পারুলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘরের আলো চিরদিনের জন্য নিভে গিয়েছিল।
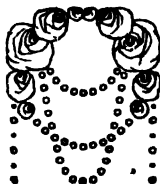
পাঁচ বিঘা ভুঁই।

"বাবা, বাবা, শুনছ? ওঠ না। বলি শুনতে পাচ্ছ না কি?" বল্‌তে বল্‌তে সদু ওরফে সৌদামিনী তার মৃত্যু-শয্যায় শায়িত বৃদ্ধ বাপকে ঠেলে তুলবার জন্য নাড়া দিতে লাগ্‌ল।

এই ভাবে নাড়া পেয়ে রুগ্ন বৃদ্ধ চক্ষু বুজেই কাত্‌রে উঠলেন "এ্যাঁ" —গলার স্বর এত অস্পষ্ট যে মনে হল যেন সেটা কণ্ঠ পেরিয়ে ঠোঁটের ধারে আসতে চেষ্টা করেও আসতে পার্চ্ছে না সে ক্ষমতা তার তখন আর ছিল না।

একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর মাটীতে বৃদ্ধ নকুল সাহা পড়েছিল। পরণে তার একটা হাত আষ্টেকের ছেঁড়া ধুতি, গা খালি গলায় কেবল মোরা সোণার একটা মাদুলী পাড় ছেঁড়া সুতায় বাঁধা ছিল।

সৌদামিনী তার বড় মেয়ে। ছোট মেয়ে ক্ষান্তমণিরও শ্বশুরবাড়ী ছিল ঐ গ্রামে; সৌদামিনীর বাড়ীর খুব কাছেই। এতদিন নকুল ক্ষান্তর বাড়ীতেই ছিল, সেখানে অসুখটা বাড়াবাড়ি হতেই সৌদামিনীর বাড়ীতে এসেছিল। আজ দুদিন হল সে এসেছে। যখন এসেছিল তখন তার যে জ্ঞান ছিল, আজ তার সে জ্ঞানটুকুও ছিল না। কিন্তু সৌদামিনী এটা

কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছিল না এবং সেইজন্যই সে ডাকাডাকি আরম্ভ করে নাড়া দিচ্ছিল।

সৌদামিনীর দশ বছরের মেয়ে ফুলী, সেও পাশে দাঁড়িয়ে ডাকছিল, "দাদু, ও দাদু, সাড়া দিচ্ছ না কেন? বড় ভয় করছে যে—সাড়া দেও না।" বেচারী কিছু বুঝতে না পেরে ফোঁফাতে সুরু করলে।

সৌদামিনী তার এই ফোঁপানি দেখে জ্বলে গেল—"চুপ্ কর্ হতভাগা মেয়ে ন্যাকামী করে আবার কান্না হচ্চে" বলতে বলতে তার মাথাটা দেওয়ালের সঙ্গে ঠুকে দিলে। সে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"বাবা, বাবা, বলি উঠ্‌বে কি না; না, এই রকম মট্‌কা মেরে পড়ে থাকবে? ভাল জ্বালাতনে পড়লাম গা—আবার চোক বুঁজে পড়ে আছে—ওঠ বল্‌ছি শিগ্‌গীর।"

নকুলের তরফ থেকে কোন উত্তর না পাওয়ায় সৌদামিনীর কণ্ঠস্বর ক্রমশঃই উঁচু পর্দ্দায় উঠতে লাগল,—"এখনও বলছি ওঠ, উঠে ক্ষেন্তির ওখানে যাও, এখানে তোমার থাকা হবে না; দুদিন রেখেছি এই যথেষ্ট তার বেশী তোমায় রাখবার আমার ক্ষমতা সেই—রোগে পড়ে সদির নাম মনে পড়েছে, যখন সুদিন ছিল তখন ক্ষেন্তিই সব; যা কিছু ছিল সব ক্ষেন্তির পেটে দিয়ে, এখানে মরতে এসেছ। সদির কাছে ও সব চালাকি হবে না, ওঠ বলছি—যাও, তোমার আদুরে মেয়ে ক্ষেন্তির কাছে যাও"—বেশ জোর করেই সৌদামিনী নকুলকে নাড়া দিয়ে দিল।

"ওঃ, একটু জল", মুমূর্ষুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিতে লাগল, মুখের ভিতর পর্য্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছিল; জিব ঝুলে পড়বার মত হয়ে উঠ্‌ছিল।

সৌদামিনীর ধৈর্য্যের সীমা বোধ হয় এইবার শেষ হয়ে গেল ; সে হঠাৎ নকুলের পা দুটা ধরিয়া টেনে তুল্লে, "ওঠ বলছি, শিগ্‌গীর ওঠ" নকুলের মাথা ও পিঠ মাত্র মাটিতে ঠেকে ছিল ; কিন্তু সে পড়ে রইল শুক্‌না কাঠের মত নিশ্চল।

তারপর তাকে মাটিতে নামিয়ে বগলের তলায় হাত দিয়ে সৌদামিনী নকুলকে মাদুর থেকে সম্পূর্ণ উঠিয়ে দেবার জন্য তাকে উঁচু করে ধরে তুলতেই দেখতে পেলে যে দেওয়ালের গায়ে কার ছায়া এসে পড়েছে, সে বুঝতে পারলে যে এই ঘরের দিকে কেউ আসছে, সে তাড়াতাড়ি নকুলকে টেনে মাদুরের উপর শুইয়ে দিতে দিতেই, পাশের বাড়ীর নিস্তারিণী ঠাকরুণ দরজার গোড়ায় এসে বল্লেন, "কি গো, ফুলীর মা, তোমার বাপ কেমন আছে?"

সৌদামিনী মুখ নীচু করে উত্তর দিলে, "আর মা, ভাল মোটেই ভাল না!"

সমবেদনার স্বরে নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করলে, "তা কাকে দেখাচ্চ?"

সৌদামিনী একটু ইতস্ততঃ না কোরেই বল্লে, "কাল পর্য্যন্ত ত ভালই ছিলেন ; তোমার ছেলে একটু ভাল দেখেই কাজে গেল ; তারপর এখন অবস্থাটা একটু খারাপ বলে মনে হচ্চে।"

নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করলে, "সিদ্ধু ডাক্তারকে খবর দিয়েছ?"

সৌদামিনী মুখটা একটু শুকনো করে বল্লে, "কে আর দেবে মা ; যে দেবার লোক সে ত গেছে নিজের কাজে।"

"আচ্ছা, আমিই না হয় সিদুকে একবার আসতে বলে যাচ্ছি"—এই বলে নিস্তারিণী ডাক্তারকে ডেকে দিতে চলে গেল।

নিস্তারিণীর এই গায়ে পড়া ভাবটায় সৌদামিনী বিষম চটে গেল, তার

সেই ঝালটা সামলাবার ভার পড়ল, হতভাগ্য নকুলের উপর। কিন্তু তখন বিশেষ কিছু করবার উপায় নাই, সিদু ডাক্তার এখনি এসে পড়বে। সে নিজের ঘর থেকে একখানা কাঁথা এনে মাদুরের উপর পেতে দিলে; নকুলের মাথার নীচে একটা ছোট বালিসও দিয়ে দিলে; পায়ের উপর একটা চাদর ঢাকা দিতে দিতে বলতে লাগল, "পাঁচ বিঘে জমী, দু-দুটো গরু, একটা সিন্ধুক বোঝাই বাসন, আরও কত কি; ওঃ! প্রায় হাজার টাকা—"

টাকার কথা ভাবিতে ভাবিতে সৌদামিনীর হাত দুটা শক্ত হয়ে উঠল; সে চাদরটা টেনে ফেলে দিয়ে নকুলকে দুহাতে ধরে বলতে লাগল, "আমার এখন মনে হচ্চে, গলা টিপে যদি এখনই মেরে ফেলা যায়—লোকে নিন্দে করবে? করুক্! দোষ দেবে? দিক্। ওঃ পাঁচ পাঁচ বিঘে জমী! হাজার টাকা!! উঃ, আমার যদি অগজ থাকত—", তার হাতটা ক্রমশঃ ভেরে উঠছিল, সে হাতটা আল্গা করতেই নকুল বিছানার উপর পড়ে গেল; নকুলের মুখের উপর ঝুঁকে সে গজরাতে লাগল, "বেরোও, বেরোও আমার বাড়ী থেকে—যাকে টাকা জমী সব দিয়ে এলে, যাওনা এখন সেখানে—এখানে মরতে এলে কেন? যাও তোমার আদুরে সোহাগের মেয়ের কাছে, যাও।" সে হয়ত এইভাবে অনেকক্ষণ বকে যেত, যদি না সেই সময় সিদু ডাক্তারে সঙ্গে নিস্তারিণীকে বাড়ীর ভিতর ঢুকতে দেখতে পেত।

নিস্তারিণী ঘরের ভিতর ঢুকে সৌদামিনীকে বল্লে, "তুই একলা আছিস্ বলে সিদুর সঙ্গে আমিও এলাম।"

সৌদামিনী মাথার কাপড়টা টেনে এক কোণে সরে গেল; নিস্তারিণী রোগীর পাশে বসে সিদু ডাক্তারের সব প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল।

সৌদামিনী ভাবছিল, "একই বাপের মেয়ে আমরা, অথচ একজনকে তিনি সর্ব্বস্ব দিয়ে গেলেন, আর আমাদের দেবার মত তাঁর একটা কাণা কড়িও জুটল না—পাঁচ বিঘে জমীর সবই পেলে ক্ষেন্তি। ঘর, দোর, বাসন, বিছানা সব পেলে ছোট, আর আমাদের দেবার মত কিছু জিনিষই উনি খুঁজে পেলেন না। কেন? আমরা কি ওঁর কিছুই করি নি? মা মারা যাবার পর, এই সদি না থাকলে এত দিনও বাঁচতে, হত না যে।" রোযে, ক্ষোভে তার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল।

কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে নিস্তারিণী সৌদামিনীর দিকে তাকাতেই তার চোখে জল দেখতে পেয়ে বল্লে, "ছিঃ বৌ, কেঁদে অকল্যাণ করিস নি। সিদু ত বলছে এখনও সম্পূর্ণ ভরসা ছেড়ে দেবার মত ত কিছুই হয় নি।"

সৌদামিনীর ভিতরটা এই কথায় একেবারে জ্বলে গেল; কিন্তু সে ঠোঁট চেপে রইল, কোনও জবাব দিলে না।

ঘরের ভিতরটা সব নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে দরজাটা নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। সিদু ডাক্তার নিঃশব্দে তার কাজ করছিল; সৌদামিনী চুপ করে, তার কাজগুলা দেখে যাচ্ছিল।

সিদু ডাক্তার পরীক্ষা শেষ করে একখানা কাগজে ঔষধ লিখে দিয়ে নিস্তারিণীর হাতে দিয়ে বল্লে, "এই ঔষধটা ডাক্তারখানা থেকে আনিয়ে নিতে বলবেন। আমি চল্লাম, রুগী ওবেলায় কেমন থাকে খবর দিবেন।" এখন যে ভিজিটটা পাওয়া যাবে না, এটা বুঝতে পেরেই ডাক্তার আস্তে আস্তে চলে গেল।

নিস্তারিণী বল্লে, "এই কাগজটা রাখ্; হারান এলে ঔষধটা আনিয়ে

নিস্; কেমন থাকে ডাক্তারকে জানাস্; আমিও যাই বাড়ীর সব কাজই পড়ে আছে; ওবেলায় যদি পারি ত আবার আসব'খন।"

নিস্তারিণী বাহির হইয়া গেলে, সৌদামিনী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ হাতের কাগজখানায় চোখ পড়তেই সে কাগজখানা টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে জানালা গলিয়ে ফেলে দিলে। "ওঃ, লাট সাহেবকে ঘটা করে ডাক্তার দেখিয়ে, ঔষধ আনিয়ে চিকিৎসা করতে হবে! মর, মর, এখনি মর!" বলিতে বলিতে নকুলের মাথার তলা থেকে বালিসটা নিয়ে ঘরের বাহিরে ফেলে দিয়ে এক রকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যার তখনও অল্প বাকী ছিল। দূরের গাছপালাগুলা ক্রমশঃই অস্পষ্ট হয়ে আসছিল। উঠানের উপর অন্ধকার ইতিমধ্যেই জমা হয়ে উঠেছিল। নকুলের ঘরের সামনে দালানে বসে সৌদামিনী কত কি ভাবছিল। চোকদুটা কখনও সেই অন্ধকারের মধ্যেই রোষে জ্বল জ্বল করছিল; কখনও বা যাতনায় সেই চোখেই বাধা না মেনে, জল টপ্ টপ্ করে গড়িয়ে পড়ছিল।

নিস্তারিণী খবর নেবার জন্য লোক পাঠিয়েছিল; তাকে সৌদামিনী বলে দিয়েছে যে নকুল প্রায় সেই রকমই আছে, তার ছেলে এখনও কাজ থেকে ফেরে নি; সেজন্য সিধু ডাক্তারের কাছে লোক পাঠান হয় নাই।

এইবার সে উঠে নকুলের ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলে; নকুল তেমনি অসাড় নিস্পন্দ ভাবে শুয়ে আছে, যেমন সে তাকে শুয়িয়ে রেখে গিয়েছিল। সৌদামিনী সামনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দেখলে,

সে গাঢ় অন্ধকারের মধ্য দিয়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ফুলী রান্নাঘরের দাওয়ার কাছে কতকগুলা পুতুল নিয়ে নিজের ছোট সংসার গুছাচ্ছিল, মার কাছে আসতে বা দাদুর ঘরে ঢুকতে তার সাহস হচ্ছিল না।

হঠাৎ সেই দিকে নজর পড়তেই সৌদামিনী ডাকলে, "ফুলী"—সে ডাকে স্নেহরসের গন্ধও ছিল না। ফুলী চমকে পিছনে ফিরলে; "বাবার ঘরে আয় একবার।"

নকুলের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে সৌদামিনী ভাবতে লাগল; একবার জানালার কাছে গিয়ে দেখলে রাস্তায় কেউ আসছে কি না—তারপর নকুলের বিছানার পাশে ফিরে গিয়ে ফুলীকে ডেকে বল্লে, "ফুলী, বাবার পাদুটা ধর্ ত।" ফুলী অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সে জ্বলে গিয়ে বল্লে, "যা বলছি এখুনি কর্, রাক্ষুসী মেয়ে।"

ফুলী ভয়ে ভয়ে গিয়ে নকুলের পাদুটা ধরলে; সৌদামিনী তার মাথাটা উঁচু করে ধরে, এক রকম প্রায় টানতে টানতে ঘরের বাহিরে নিয়ে এল।

নকুল অচৈতন্যের মত পড়েছিল; তখন জ্ঞান থাকলেও বোধ হয় সাড়া দেবার মত অবস্থা তার ছিল না। তাকে দেখেও বুঝা গেল না যে, সে কিছু বুঝতে পারছে কিনা। ফুলী দুবার চৌকাটে হোঁচট খেলে, তার ছোট্ট হাতের ভিতর দিয়ে নকুলের পা দুটা পড়ে যাবার মত ঝুলতে লাগল; এমনি ভাবে তাকে টেনে এনে সৌদামিনী দাওয়ায় শুইয়ে দিলে।

তারপর গোয়ালে গিয়ে গরুগুলাকে সরিয়ে দিলে—বুধী ও রাঙ্গার গামলায় কিছু খড় দিয়ে তাদের বাহিরে বেঁধে দিলে। তারপর ফুলীকে

আর সৌদামিনীতে ধরাধরি করে তাকে গোয়ালঘরের মধ্যে সেই মাদুরটা পেতে শুইয়ে দিলে। বোধ হয় এই টানাটানিতে নকুলের একটু জ্ঞান এসেছিল, সে কাত্‌রে উঠল।

সৌদামিনী গোয়ালের দরজা বাহির থেকে বন্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে বল্লে, "এখন যত পার চেঁচাও, কেউ—ই শুনতে পাবে না। আজ রাত্রিতে এখানে মর ত ভালই, নয় কাল সকালে ক্ষেত্তির বাড়ী চালান করব। যার মড়া, তার বাড়ীতে মরগে না, আমার বাড়ী জ্বালাতে এসেছ কেন?"

হঠাৎ তার দৃষ্টি নকুলের মাদুলীর উপর পড়ল, "ও মাদুলীটা শুদ্ধ মরবে কেন?" বলে সেটা নেবার জন্য ফের সে ঘরের ভিতর ঢুকল। তারপর সেটাকে গলা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে দরজাটার শিকল টেনে দিয়ে সে বাড়ার মধ্যে চলে গেল।

রাত্রির অন্ধকার তখন চারিদিক ছেয়ে ফেলেছে। সৌদামিনী ঘরের প্রদীপটা জ্বেলে দিলে। মাদুলীটার মুখটা তখুনি খুলে ফেললে তার ভিতর থেকে একখানা কাগজ বেরিয়ে পড়ল; সেটা সে তুলে আলোর সামনে ধর্লে; একখানা নোট—কত টাকার নোট তা সে বুঝতে পার্লে না, তবে সেটা যে নোট তা সে বেশ বুঝেছিল, তার ঠোঁটের কোণে ক্ষণিকের একটা হাসি খেলে গেল—"বাবা ঠিকই বল্‌তো ত, শ্রাদ্ধের খরচ রেখে যাবে।" সে নোটখানা আঁচলের কাণে গেরো বেঁধে রেখে দিলে হারান এলে দেখাবে নোটখানা কত টাকার।

ফুলী এসে সৌদামিনীকে জিজ্ঞাসা করলে, "মা, দাদুকে একবার দেখতে যাবে না?"

সৌদামিনী রেগে তার দিকে ছুটে গেল তাকে মারতে, "দূর হ হতভাগা মেয়ে, তোর এত টস্‌ কিসের লা?"

ফুলী কাঁদতে কাঁদতে বাহিরে চলে গেল। সৌদামিনীও রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

রাত্রি প্রায় নটা দশটার সময় হারান তার কাজ থেকে ফিরলে। সৌদামিনী তার হাত পা ধোবার জল এগিয়ে দিলে। মুখহাত ধুয়ে হারান যখন খেতে বসল, সৌদামিনীও পাখা হাতে করে পাশে বসল।

হারান খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার বাবা কেমন আছেন? কৈ, ঘরের ভিতর ত তাঁকে দেখতে পেলাম না, ওবাড়ী গেলেন না কি?"

সৌদামিনী মুখখানা কুঁচকে বল্লে, "ওঃ! ওবাড়ীর রস ত কত, তাঁরা আবার আসবেন বাবাকে নিতে? এখন ত আর বাপের কিছু নেই, তাই তাঁর আদরও কমে গিয়েছে।—আমার বাড়ীতেই বা এসব উৎপাত কেন? আমার নিজেরই একে ঘর দোর নেই। বাবাকে গোয়ালঘর পরিস্কার করে, সেইখানেই রেখে দিয়েছি।"

সিদু ডাক্তার বা নিস্তারিণীর কোনও উল্লেখই সে করলে না।

হারান বেশ একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, "তোমার বাপকে গোয়ালে রেখে দিলে? লোকে বলবে কি?"

সৌদামিনী খুব ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিল, "ইঃ, লোকে কি বলবে! যখন আমায় ঠকিয়ে ক্ষেন্তির পেট ভরাচ্ছিল, তখন লোকে কিছু বলতে পারে নি? এখন লোকে বলবে!"

হারান সৌদামিনীকে, বিশেষ তার মুখকে, খুব ভয় করে চলত, সে

আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লে, "তা হলেও পাঁচজনের পাঁচ কথা, বুঝলে কি না। লোকে ত আমাদেরই দুষবে।"

সৌদামিনী বল্লে, "সে আমি বুঝব'খন। এখন এটা কি দেখ দেখি।" বলে আঁচলে বাঁধা নোটখানা হারানকে দিলে।

হারান বাঁ হাতে নোটখানা আলোর কাছে নিয়ে গিয়ে বেশ করে দেখে বল্লে, "এ যে নোট, ৫০৲ টাকার কোথায় পেলে?"

সৌদামিনী হেসে বল্লে, "বাবার মাদুলীর ভিতর থেকে"; তার-পর দাঁতের উপর দাঁত চেপে বল্লে, "পাঁচ বিঘে জমী, আরও সব কত কি ওকে দিয়ে এলেন; আর মাত্র ৫০৲ টাকা নিয়ে এসে উঠলেন আমাদের বাড়ী। তাও আমায় দেওয়া হয় নি। আমি মাদুলী ভেঙ্গে বার করে নিয়েছি!"

হারানের টাকার আনন্দে খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল; সে বল্লে, "দেখ জলিম সর্দ্দার বলছিল, ৫০৲ টাকা দিলে তার মাঠের দুবিঘে জমী আমায় লেখাপড়া করে দেয়; খাজনা বছরে দশ টাকা। কালই তাকে এই ৫০৲ টাকা দিয়ে জমীটার বন্দোবস্ত করে ফেলি গে। খাজনাটা মাদুলী থেকে পাওয়া যাবে না? কি বল?"

সৌদামিনী হেসে বল্লে, "নিশ্চয়ই। এর আর কি কথা।"

হারান খাওয়া শেষ করে পান নিয়ে ঘরের দিকে চলে গেল। সৌদামিনীও নিজের আর ফুলীর খাবার নিয়ে বসল।

সৌদামিনী যখন শুতে এল, তখন হারান বোধ হয় ঘুমিয়ে ঘ... জমীরের দুবিঘা জমার স্বপ্ন দেখছিল; তার পাশে শুয়ে সৌদা... নকুলের পাঁচবিঘে জমীর কথা ভাবতে লাগল, তারপর সেও ঘুমিয়ে

পাঁচ বিঘা ভুঁই।

সৌদামিনী সেইখানেই কাঠ হয়ে বসে রইল। তার চোখের জল অনেকক্ষণ শুকিয়ে গিয়াছে। (৫১ পৃষ্ঠা)

কিরণ]

(দুই)

নকুল সেই গোয়ালের মধ্যেই পড়ে রইল। তার খোঁজ নওয়া দরকার বলে কেউ মনে করলে না।

সেই রাত্রেই নকুল মারা গেল। দুর্গন্ধময় গোয়ালের বন্ধ ঘরের মধ্যেই কিরূপে তার সকল যন্ত্রণার অবসান হল, তার সংবাদ কেহই রাখিল না; মরণকালে যে জল তার চোখের কোণে জমা হয়েছিল, তাহা মুছাইবার জন্য কেহই তার পাশে আসিল না; অন্তিমের শেষ নিঃশ্বাস বাহির হবার আগে যে অস্ফুট ব্যাকুলতা ও হাহাকার তাহার প্রাণে জেগেছিল, তাহা কেহই শুনিল না।

সৌদামিনী তাকে শোয়াইয়া রাখিয়া আসিলে কিছুক্ষণ পরে তার একটু জ্ঞান হয়েছিল; সে চারিদিকে হাত বুলিয়ে দেওয়াল বুঝতে পারলে, তার মেয়ের নাম করে সে অনেক ডাকাডাকি করলে, তার কোনও সাড়া পেলে না। তখন সে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে একটু উঁচু হয়ে খিল ধরে টানাটানি করলে; টানাটানিতে তার মুখের পাশে ফেনা দেখা দিতে লাগল। সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে টানতে লাগল একটু ফাঁকা বাতাস পাবার জন্য। বন্ধ ঘরে তার দম আটকাইয়া যাবার মত হয়েছিল। বাহির থেকে বন্ধ থাকায় দরজা খুলল না। কোনও আওয়াজ কারও কাণে গেল না। কিছুক্ষণ টানাটানিতে সে ক্লান্ত হয়ে সেইখানেই লুটিয়ে পড়ল—একটা শব্দও

তার মুখ থেকে বাহির হল না; শুধু চোখের পাশ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। দু' একবার মাত্র দেহটা একটু কেঁপে উঠল, তারপর সব স্থির হয়ে গেল!

হারাণ পরদিন সকালে নকুলের খবর নেবার জন্য দরজা খুল্লে, কিন্তু দরজাটা ভিতরদিকে এগুচ্ছিল না। হারান গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে ঠেলতে দরজাটা একটু ফাঁক হল; হারান সেইটুকুর ভিতর দিয়ে শরীরটা ঢুকিয়ে দিলে কিন্তু যা দেখলে তাতে তার শরীরের রক্ত জল হয়ে আসবার উপক্রম হল।

নকুলের হাতপাগুলা জড়িয়ে গোলাকার পিণ্ডের মত হয়ে গেছে, ঠোঁটের ফেনাগুলো জমা হয়ে শুকিয়ে রয়েচে; হাঁপাতে হাঁপাতে মুখটা সম্পূর্ণ ফাঁক হয়ে গেছে। নকুলের মৃত দেহটা শক্তকাঠ হয়ে সমস্ত দরজা জুড়ে পড়ে রয়েছে।

ভয়ে হারানের পা দুটা যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল; কোনও রকমে টলতে টলতে সে যখন ঘরের মধ্যে এসে পৌঁছাল, তখন তার কথা কইবার শক্তি মোটেই ছিল না; কতকটা ভয়ে এবং কতকটা বিস্ময়ে সে যেন একরকম হয়ে গিয়েছিল।

সৌদামিনী সবেমাত্র উঠে বাসী ঘর ঝাঁট দিয়ে বাহিরে আস্‌ছিল, সে হারানের এই রকম অবস্থা দেখে তাকে একটা ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ও কি, ওরকম করছ কেন? কি হয়েছে? ভূত দেখলে নাকি?"

হারান বিকৃত অস্পষ্ট স্বরে যা বল্লে তাতেই বোঝা গেল যে, গোয়ালঘরে নকুল মারা গেছে। তার গলার স্বর একদম বন্ধ হয়ে যাবার মত হয়েছিল।

"বাবা মারা গেছে?—যাক্।" বলে সৌদামিনী এমন একটা নিঃশ্বাস

ফেল্লে, যাতে বুঝা গেল যে সে মস্ত একটা ভাবনার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করলে, "মড়াটা এখন আছে কোথায়?"

হারান শুষ্ক স্বরে উত্তর দিল, "গোয়ালেই।"

কিন্তু এখন মড়াটা রাখা যায় কোথায়? সেইটাই ছিল তখন সৌদামিনীর প্রধান ভাবনা।

একটু সাহস পেয়ে হারান বল্লে, "কেন, ঘরের মধ্যে।"

সৌদামিনী অবাক হয়ে বল্লে, "ঘরের মধ্যে কি গো? তার চেয়ে বাইরের উঠানেই বার করে রাখগে। এখন একটু বেলা হয়ে গেছে, বাইরে রাখলেই হবে।"

হারান সৌদামিনীর এই রকম কথায় ও তার ব্যবহারে ক্রমশঃ বিরক্ত হয়ে উঠছিল। সে বল্লে, "সে কি? তোমার বাপকে ঐ ভাবে বাইরে উঠানে ফেলে রেখে দেবে?"

সৌদামিনী তার বিরক্তিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, জোর করেই বল্লে, "হাঁ, বাইরের উঠানেই।"

সৌদামিনীর কথার উপর বিশেষ কিছু বলা নিরর্থক মনে করে হারান গোয়ালের দরজা খুলে ফেললে। সৌদামিনী সেই ফাঁকে নকুলের বিকট চেহারা দেখে ভয়ে পিছিয়ে গেল। তার হাত পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। হারান জোর করে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে বল্লে, "চুপ, তুমি এত ভয় পেলেই সব মাটী। এখনই মড়াটা ধরাধরি করে বাইরে আনতে হবে।"

তারপর তারা দুজনে ধরে তাকে উঠানে নামিয়ে রাখলে। সৌদামিনী চোখ ফিরিয়ে চলতে লাগল। নকুলের দিকে তাকাতেই তার বিশেষ ভয় করছিল। নকুলের মৃত দেহটা ফুলে ভারী হয়ে উঠেছিল, দুজনের সেটা বইতে খুবই ভার লাগছিল; উঠানে নামিয়ে দিয়ে সৌদামিনী ক্লান্তিতে হাঁফাতে হাঁফাতে বসে পড়ল, হারানও তার কোঁচার খুঁটে ঘাম মুছতে লাগল।

তারপর—এখন ত সব লোকজনদের খবর দিতে হবে। সৌদামিনীর মতে এই ঠিক হল যে, হারানই গাঁয়ে খবর দিক, আর খেন্তমণিকে খবর দেবার ভার পড়ল ফুলীর উপর।

হারান ও ফুলী বেরিয়ে গেলে, সেই মড়ার সামনে বসে থাকতে সৌদামিনীর সাহসে কুলালো না, সেও আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। নকুলের মৃতদেহটা সেই মাটীর উপর পড়ে রইল।

ক্রমে ক্রমে দু একজন করে পড়সীরা সব এসে জমা হতে লাগল। হারানও কিছুক্ষণ পরে লোকজন নিয়ে পৌঁছাল। ফুলীর মুখে খবর পেয়ে খেন্তমণিও চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বাপের শোক পাড়ার সকলকে জানিয়ে দিতে দিতে যখন সৌদামিনীদের বাড়ী ঢুকল, তখন স্ত্রী পুরুষে উঠান প্রায় ভর্ত্তি হয়ে গেছে, আর তার স্বামী লক্ষ্মীকান্ত হারানের সঙ্গে কি একটা বিষয় নিয়ে একদিকে বেশ ভালরকম তর্ক লাগিয়ে দিয়েছে।

(তিন)

ব্যাপারটা এই,—সৎকারের খরচা দেবে কে? লক্ষ্মী বলছে নকুল যখন হারানের বাড়ী মরেছে, হারানই সমস্ত খরচা বহন করবে। হারান তার জবাবে বলছিল, নকুলের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করেছে ঐ লক্ষ্মী, সেই সমস্ত খরচা দেবে। কিন্তু এর কোনও মীমাংসা হচ্ছেনা দেখে, বুড়ার দলেরা এর একটা ব্যবস্থা করতে তখনই বাড়ীর বাহিরের মাঠের উপর বসে গেল; লক্ষ্মী ও হারাণ তাহাদের সঙ্গে বাহিরে চলে এল।

মাতব্বর পাঁচজনে অনেক বাদানুবাদের পর ঠিক করলেন যে, লক্ষ্মী যখন নকুলের সব নগদ সম্পত্তি পেয়েছে ঘাট-খরচটা সেই করবে, তবে হারানের বাড়ী যখন মরেছে, তখন হারানকেও কিছু খরচ করতে হবে, কাঁধী খরচটা তার। বাধ্য হয়ে হারান ও লক্ষ্মীকে এই মতে রাজী হতে হল।

বাড়ীর ভিতর তখন ক্ষেন্তমণি ও সৌদামিনীতে ভয়ানক ঝগড়া বেধে গেছে। সৌদামিনী ক্ষেন্তকে দেখেই জ্বলে গিয়েছিল, তাকে বেশ দুকথা শুনিয়ে দিয়ে বল্লে, "বাপের যা ছিল, ফুসলে ফাসলে হাতিয়ে নিয়ে, তারপর তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলি, এমন এসেছিস্ দেখতে যে দিদি কি করে বাপের ঘটা করে শ্রাদ্ধ করে। এ বাড়ী ঢুকতে লজ্জা হলনা তোর? দূরহ, দূরহ পোড়াকপালী! তোর সোহাগের বাপের মড়া নিয়ে দূর হয়ে যা। ঘাটে নিয়ে যাবার পয়সা না জোটে, ভাগাড়েই ফেলগে যা—"

এই বলে রাগের মাথায় আরও কতকগুলা এমন গালাগালি দিয়ে বস্ল, যা সৌদামিনীর বোন খেন্তমণির সহ্য হওয়া ত দূরের কথা, অন্যের পক্ষেও হজম করা শক্ত হত, সে ত তারই বোন। সেও তার উত্তরে সৌদামিনীকে দুকথা শুনিয়ে দিতে ইতস্ততঃ কর্লে না। তারপর যে ঝগড়া দুই বোনে বাধল, ঝগড়া-শাস্ত্রে তার নাম "শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ"—তদের এই গোলমাল ও ঝগড়া শুনে ব্যস্ত হয়ে সব লোক বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়ল। তারপর যখন তাদের দুজনকে দুদিকে টেনে নিয়ে যাবার জন্য তাদের স্বামীরা চেষ্টা করছিল, তখন তাদের ঝগড়াটা এমন পেকে গিয়েছে যে, তাদের দুজনেরই এত লোকের সামনে চেঁচামেচি করতে একটুও লজ্জা করছিল না।

লক্ষ্মী ক্ষেন্তকে টেনে বাহিরে এনে লোক দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলে; সৌদামিনী এতক্ষণ বাপের শোকে না কাঁদলেও কতকটা এত অপমানে আর কতকটা বাপের টাকার শোকে এইবার ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌ল। হারান তাকে থামাতে এসে এমন ধমক খেলে যে সে বেচারা হতবম্ভ হয়ে কিছু না বলেই ফিরে গেল। ক্ষেন্তও সৌদামিনীকে গালাগাল দিতে দিতে বাড়ী ফিরে গেল।

মড়া নিয়ে ঘাটে পৌছাতেই দুপুর উৎরে গেল। নকুলের দাহ কার্য্য যখন শেষ হয়ে গেল, তখন বেলা আর মোটেই ছিল না।

সৎকারের পর স্নান করে উঠে, বাড়ী ফেরবার আগে, কাঁধীরা হারানকে মনে করিয়ে দিলে কাঁধী খরচটা তার। লক্ষ্মী ত ঘাটের সব খরচই করেছে।

হারান তখনি তাদের নিমন্ত্রণ করলে কিছু জল খেতে, সেই সঙ্গে পেট ভরে তাড়ী খাবার জন্যে। ঘাটের উপরেই তাড়ীর দোকান, সেখানে তারা

একে একে সকলেই ঢুকে পড়ল। সে নিমন্ত্রণে লক্ষ্মী বা হারান কেহই বাদ পড়ল না।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় হারান পাড়ার একটা ছোকরার কাঁধের উপর ভর দিয়ে বাড়ী ঢুকল। সৌদামিনী স্বামীর আগমনের প্রতিক্ষায় বাহিরেই অপেক্ষা করছিল। তাকে ডেকে ছেলেটী বল্লে, "কাকী, সমস্ত দিনের পরিশ্রমে এর বোধ হয় অসুখের মত করেছে, রাস্তায় কাঁপতে কাঁপতে আসছিলেন, চলতে পারছিলেন না; তাই ধরে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলাম। আপনি এখনি এঁকে ভাল করে শুইয়ে দিন।"

সৌদামিনী বুঝতে পারলে যে হারান আজ বেশ মাতাল হয়েছে। স্বামীর এই অবস্থা দেখে যেন শোক তার নূতন করে জেগে উঠল, সে ফুঁপিয়ে উঠল। হারান টলতে টলতে চৌকীর দিকে এগিয়ে চলল, সৌদামিনী তাকে ধরতে আসতেই তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে সে বলতে লাগল—'থাম্, ন্যাকা মাগী থাম্, প্যান প্যান করিস নি— জানিস শ্বশুর আমায় দু দু বিঘা জমী দিয়ে গেছে। কাল থেকে সে জমী আমার—আমার—।" বলতে বলতে সে চৌকীর উপর শুয়ে পড়ল।

খনিকক্ষণ চীৎকার করে, মাতাল হারান ঘুমিয়ে পড়ল। সৌদামিনী সেইখানেই কাঠ হয়ে বসে রইল। তার চোখের জল অনেকক্ষণ শুকিয়ে গিয়েছিল।

আগন্তুকের আগমনে।

দেশে......বাপ ভাবছেন......এইবার বুঝি......বংশটা লোপ পেলে।

মহিলা প্রেসের সৌজন্যে]

[৩৬ পৃষ্ঠা।

আগন্তুকের আগমনে।

আদি-পর্ব্ব

"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যং অর্হতি" মনুঠাকুরের এই মতের বিরুদ্ধে বাংলার মেয়েদের যে দল গড়ে উঠেছিল, নীলিমা ছিল সেই দলের একজন। কিন্তু তাই বলে তারা যে একদম পুরুষদের বাদ দিয়ে রেখেছিল বা রাখবার কোন চেষ্টা করেছিল তা নয়, নিতান্ত দরকারী সহযাত্রীর মতন তাদের গ্রহণ করেছিল।

নীলিমার ধারণা যে পুরুষদের দাসীত্ব করবার জন্য মেয়েরা জন্মায় না। এক সংসারে থাকতে গেলে, সেই সংসারের কাজে তাদের যতটুকু সাহায্য করা দরকার সেই টুকুই মাত্র তারা করবে, তার বেশী কিছু দাবী তারা কিছুতেই মানবে না। সেজন্য স্বাধীন ভাবে নিজের খোরাক নিজে রোজগার করবার জন্য সে নানা রকম শিল্পকাজ শিখেছিল, তবে তার কাপড়ের ফুলগুলারই কাটতি ছিল বেশী।

ধীরেশ ছিল আর্টিষ্ট অর্থাৎ সে ছবি আঁকত। তার ধারণা যে সে বিয়ে করে একটা ভার বাড়াবে না, তার ইচ্ছা সে এমন একটী মেয়েকে বিয়ে করবে যে নিজের খরচ নিজে চালিয়ে নেবে তার উপর মোটেই নির্ভর করে থাকবে না—আর তার স্ত্রী হবে তার বন্ধু, তার জীবনের সাথী—তার রাঁধুনি বা দাসী নয়।

অদৃষ্ট তাদের দুজনকে যখন এক করে বেঁধে দিলে, তখন তারা দুজনে দেখে শুনে এমন একটা বাড়ীতে এসে উঠ্‌ল যার মাত্র তিনখানা ঘর। দুপাশের দুখানা ঘরে দুজনে থাকত, আর মাঝের ঘরখানা ছিল, তাদের দুজনের সাধারণ সম্পত্তি। সে ঘরের একটা কোণে থাকত ধীরেশের ছবি অঁকবার কাট, তার তুলির বাক্স, ছোট ছোট টুল প্রভৃতি, আর তার অন্য দিকে ছিল নালিমার সেলাইয়ের কল, ছুরি, কাঁচি, সুতা, কাপড়-চোপড়ের ড্রয়ারওলা চৌকী, আর নানা রকম রংএর কাপড়ের দিস্তা। এই ঘরটাই তাদের দুজনের হত সমস্ত দিনের আড্ডা-ঘর, তারপর রাত্রে যে যার নিজেদের ঘরে শুতে যেত। তাদের নিয়ম ছিল ঘরগুলা থাকবে খোলা, যার যখন খুসি অপরের ঘরে তার অবাধ গতি থাকবে।

তারা ঠিক করলে তাদের কোন ঝি চাকর রাখার দরকার নাই, তাদের নিজেদের কাজ তারা নিজেরাই চালাবে। রান্না থেকে ঘর মুছা প্রভৃতি সব কাজই তারা ভাগাভাগি করে নিজেরাই করবে। কেবল একটা ঠিকা ঝি বাসনগুলা মেজে দিয়ে যাবে মাত্র।

কেউ কেউ বল্লে, "হাঁ, তোমরা যা করছ তা ভাল জিনিষই বটে, পদ্ধতিটা খাসা, আর ঐ Theory-টাও মোটের উপর মন্দ নয়, তবে কি জান, এখন কাচ্চা বাচ্চা নেইত, বেশ এক রকম চলছে, কিন্তু একটা হলেই ব্যাস্ সব উল্টে যাবে।"

কথাগুলা শুনে তারা নিজেরাই হেঁসে উঠে আর বলাবলি করে "আমরা না আনলে ত তারা আসছে না, তবে আর কি, না আনলেই হল।"

তাদের দিনগুলা বেশ কেটে যাচ্ছিল। সকাল বেলা উঠে ধীরেশ

কয়লা ভাঙ্গে, উনুনে আঁচ দিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দেয়। নীলিমা বিছানা তোলে, ঘর ঝাঁট দেয়, চা করে। চা খাবার পর ধীরেশ যায় বাজারের দিকে আর নীলিমা যায় রান্নার যোগাড় করতে। তারপর খাওয়া সেরে দুজনে তাদের দিনের কাজ আরম্ভ করে। কাজ করতে করতে ক্লান্ত হলে তারা ঘরের দুধার থেকে উঠে এসে দুজনে গল্প করে। মাঝে মাঝে বা দুজনে পরস্পরের কাজের পরামর্শ করে।

মাঝে মাঝে তারা দুজনে বেড়াতে যেত, খোলা গাড়ীতে। রাস্তায় পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হলে তারা কিছুই মনে কর্ত্ত না; তারা সকলের সঙ্গে বেশ খোলাখুলি ভাবেই মিশত! সকলে তাদের এই বিবাহকে বেশ সুখের বলেই ধরে নিয়েছিল. তারা ভাবত কেমন মিলে মিশে এরা দুটীতে থাকে!

কিন্তু নীলিমার মুস্কিল ছিল তার মাকে নিয়ে। তিনি মাঝে মাঝে এসে তাকে এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন, যার কোন সদুত্তর নীলিমা দিতে পারত না। তাঁর এ সব প্রশ্নের বিরুদ্ধে কোন কিছু বলতে গেলে তিনি চটে উঠতেন। একদিন তিনি স্পষ্টই তাকে বল্লেন, "দেখ বাপু, তোমরা যা খুসি তাই কর, আমরা কিছু বলতে আসছি না, কিন্তু তোমরা যে মনে করেছ ভগবানের সৃষ্টিকে উল্টে দেবে তা তোমরা পারবে না, এ আমি বলে দিচ্ছি কিন্তু।"

তারপর তিনি পড়লেন তাঁর জামাইকে নিয়ে। তিনি তাকে বুঝাতে গেলেন যে তাদের এসব কি ব্যাপার। তারা কি পৃথিবী থেকে সৃষ্টি লোপ করে দেবে? আর এই জন্যই কি তিনি তার মেয়েকে তার হাতে দিয়েছেন।

বেচারা ধীরেশ কোনও জবাব দিতে না পেরে চুপ করে থাকে। মেয়ে মাকে বলে, "মা, তোমার কি দিন দিন মতিচ্ছন্ন ধর্চ্চে, জামাইয়ের সঙ্গে যা-তা বক্‌ছ?" মা মেয়ে—জামাইয়ের উপর রাগ করে বাড়ী চলে যান। কিন্তু বেশী দিন চুপ করেও থাকতে পারেন না, আবার মাস দুই পরে তাদের খবর নিতে ফিরে আসেন। আবার পুরান কথা নূতন করে জেগে উঠে।

তারা যতই মনে করে তাঁরা বেশ সুখে নিশ্চিন্তে আছে; ততই নীলিমার মা মেয়ে জামাইয়ের উপর চটে উঠতে থাকেন।

ধীরেশের বাপ থাকেন দেশে, তাঁরা নানা লোক দিয়ে খবর নেন "বৌমার কি খবর"। এতদিনেও তাদের কোন ছেলে পুলে না হওয়ায় তাঁরা বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। বাপ ভাবছেন, এইবার বুঝি হতভাগা ছেলের জন্য বংশটা লোপ পেলে, পূর্ব্বপুরুষেরা যে এক গণ্ডূষ পাবে, তারও কোন আশা রইল না। মা ভাবছেন যে কবে তিনি ঘরে যাবেন তার আগে নাতির মুখ দেখে যেতে পার্ব্বেন না। তাঁরা চিঠির পর চিঠি দিয়ে জানাচ্চেন আর তাঁরা অপেক্ষা করতে পারছেন না শীঘ্রই তারা ছেলের আর একটা বিয়ে দেবেন। কিন্তু ছেলে—বৌ চিঠি পেয়ে হাসে, তাঁদের এই অনর্থক রাগের কিছু মানে তারা বুঝতে পারে না।

জীবনটা বেশ সুখেই কেটে যাচ্ছিল। কেহই কারও অধীন নয়। নিজের নিজের জীবনের ধারা নিজের নিজের হাতে। ঝগড়া নাই, বিবাদ নাই, বেশ শান্তিতে দিনগুলা একটা স্বপ্নের মত কেটে যাচ্ছিল। দুজনের রোজগার এক জায়গায় জড় হত; কোনও বার নীলিমার আয় বেশী হত, ধীরেশের আয় কম হত, সেবার ধীরেশ খরচও করত কম।

কোনও বার হয়ত আয় হত ধীরেশের বেশী। কিন্তু এসব গুলা তাদের কাছে খুব বেশী ছিল না; তাদের স্ফুর্ত্তি আমোদ সমান ভাবেই চলছিল। ভবিষ্যতের চিন্তা কোনও দিনই তাদের মনটা পীড়িত করত না; হেঁসে খেলে বর্ত্তমানটা কাটিয়ে দিতে পারলেই, তারা সন্তুষ্ট থাকত। ভবিষ্যতের ধার বড় একটা কেউ ধারত না।

তারা বছরের একদিন মাত্র পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করত, সেদিনের সমস্ত খরচ একজনের যে নিমন্ত্রণ করত তার। যেদিন কারও জন্মদিন আসত, সেদিন সকালেই তার নিমন্ত্রণ হত অপরের ঘরে। সেদিন থাকত দুজনেরই কাজের ছুটী।

নীলিমার যেদিন জন্মদিন, সেদিন সকালেই ধীরেশ তার ঘরের দরজায় একটা লতাপাতা আঁকা নিমন্ত্রণ কার্ড বেধে দিত। ঘুম থেকে উঠেই নীলিমা সে চিঠি পেত, তারপর ধীরেশের ঘরে আসত। সেদিন খাওয়া দাওয়া সব ব্যাপারই হত ধীরেশের ঘরে। নীলিমাও ধীরেশের জন্মদিনে তাকে নিমন্ত্রণ করত তার ঘরে, আর তাকে খাওয়াত নিজের হাতে রেঁধে।

এমনি ভাবে সুখে তাদের দু'জনের দুটী বছর কেটে গেল। শাস্ত্রকারেরা যদি বলে গিয়ে থাকেন যে, যদি ঘরে কচি কচি মুখ দেখা না যায়, তাহলে, সে ঘর আঁধার, কারণ তারাই হচ্ছে আঁধার ঘরের মাণিক, তা হলে তাঁরা ভুল বুঝে ছিলেন। এই ত তারা দিব্য সুখে স্বচ্ছন্দে বেড়াচ্ছে, কই কোনও অভাবই ত তাদের নাই, তবে কেন বুড়ার দল এমন হা হুতাশ করে।

তারা দুজনে কিন্তু মনে করত তাদের বিবাহটা একটা আদর্শ।

অন্ত-পর্ব।

হঠাৎ ক'দিন দেখা গেল নীলিমার শরীর ভার হয়ে উঠেছে, প্রথম প্রথম সে মনে করলে খাওয়া দাওয়ার গোলমালে হয়েছে, দিন কতক মাত্র সাগু খেয়েই রইল, কিন্তু কিছু উপকার হল না। ধীরেশ বল্লে, তোমার পেট হয়ত পরিষ্কার হচ্ছে না। একদিন রাত্রে তাকে খানিকটা জোলাপ খাইয়ে দিলে তাতেও কোনও সুস্থতা সে বোধ কর্লে না। দিন দিন নীলিমা দুর্ব্বল হয়ে পড়তে লাগল, তার কোনও কাজে আর উৎসাহ নাই, খাওয়ায় রুচী নাই, মনে সে স্ফুর্ত্তি নাই, সকল বিষয়ে তার কেমন একটা বিরাগ আসছিল, অথচ তার কোনও কারণ বুঝতে না পেরে মনের ভিতর তার ছটফট করছিল। একবার তার মনে হল রোজ রাত্রে ঘুস্ ঘুসে জ্বর হয় না ত? ধীরেশকে সেকথা বল্লে, ধীরেশ এক শিশি অষুধ এনে দিল। তিত ওষুধ,—এক দাগ খেয়েই সে বাদ বাকী শিশিশুদ্ধ জানালা গলিয়ে ফেলে দিলে। কিন্তু তার সব চেয়ে মুস্কিল হল যে, সে আর কাজ করতে পারছিল না; তার আয় কমে গেল, এখন থেকে তাকে ধীরেশের আয়ের উপর নির্ভর করতে হবে। সে প্রাণপণে ফুল কাটতে চেষ্টা করলে, কিন্তু অবশ হাত থেকে কাঁচি খসে পড়ল। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, ধীরেশ তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলত, "ছি, অসুখ হয়েছে এত খাটে কি, দুদিন বিশ্রাম কর, তাহলেই সেরে যাবে।"

রোগ যখন বেশী দিনের হল অথচ কোন রকমেই কমে না, তখন সে একদিন নীলিমাকে না জানিয়ে তার মাকে খবর দিলে।

হঠাৎ মাকে আসতে দেখে নীলিমা একটু আশ্চর্য্য হয়ে পড়ল, কিন্তু তিনি কোনও কথা না বলে, একটী একটী করে অসুখের সব খবরগুলা যখন জানলেন, তখন ধীরেশকে সে ঘর থেকে উঠে যেতে বল্লেন, তারপর নিজে তাঁর মেয়েকে পরীক্ষা করতে বসলেন। মেয়ে অনেক আপত্তি করলে, কিন্তু তিনি জোর করে নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন। পরীক্ষার শেষে তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল, তিনি ধীরেশকে ডেকে ঘরে এনে বল্লেন, "অন্য ডাক্তারের দরকার নাই, অসুখ কি আমি বুঝতে পেরেছি। পাড়ায় যে ধাই আছে তাকে একবার ডেকে নিয়ে এস, তা হলেই হবে।"

ধাই! ধীরেশ আশ্চর্য্য হয়ে নীলিমার মুখের দিকে তাকালে, কিন্তু তার মুখেও ঠিক সেই রকম আশ্চর্য্যের ভাব। শাশুড়ীকে ধীরেশ বরাবরই ভয় করে এসেছে, তাই কোনও কথা না বলে ধাই ডাকতে গেল।

ধাই এসে যখন এই ধারণাকে স্পষ্টই সত্য বলে জানিয়ে গেল, তখন নীলিমার মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। তার মা তাকে কঠিনভাবে হুকুম কর্লেন সে যেন তার বিছানা থেকে উঠা-নামা না করে। তিনি আজ থেকে এই বাড়ীতে থাকবেন, যতদিন না দেশ থেকে ধীরেশের মা আসছেন, আর তিনি তাঁকে আজই চিঠি লিখবেন।

নীলিমা এ সংবাদ শুনে কেঁদে ফেল্লে। সে যেটা কখনও চায় নি, আজ সেইটাই তার হতে বসেছে, তাকে অবশেষে পুরুষের বাঁদী হতে হবে! এর চেয়ে তার দুর্দ্দশা আর কি হতে পারে? তার সব শিক্ষা বৃথা হল আজ। সে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল।

ধীরেশ মনে মনে খুব খুসী হলেও, মুখখানা খুব বিমর্ষ করে তার পাশে বসল, তারপর তাকে আস্তে আস্তে বুঝাতে লাগল, "দেখ, ও সব মিছে আর ভেবে কি করবে? যা হবার তা হবে। একে শরীর খারাপ, তার ওপর ভবে ভেবে আর কেঁদে কেঁদে শরীরটা আরও মাটী করছ বই ত নয়।"

নীলিমার কিন্তু ধীরেশকে আর মোটেই ভাল লাগছিল না, কেবলই মনে হচ্ছিল, ঐ ধূর্ত্ত লোকটা ফন্দি করে তাকে ওর পায়ের তলায় রাখবার জন্যই তার এ অবস্থা করেছে। সে একটু চটেই বল্লে, "যাও আর ন্যেকামী করতে হবে না। সাধু পুরুষ এসেছেন! আমায় জব্দ করবার জন্যেই এসব ফন্দি, আমি কিছু বুঝতে পারছি না, না?"

ধীরেশ তার এই মিথ্যা রাগ দেখে মনে মনে খুব হাসলেও, মুখে তাকে কিছু বলে আর রাগাতে চাইলে না, সে চুপ করে বসে রইল। নীলিমা কিন্তু কাঁদতে থাকলেও মাঝে মাঝে দুচারটা কড়া কড়া কথা শুনাতে একটুও ইতস্তত: করছিল না।

কিন্তু নীলিমা একটা জিনিষ বুঝতে পারছিল না যে সে নিজে তার এই বিপদে যত আকুল হয়ে উঠেছিল, ভবিষ্যতের ভয়ে সে যত শিউরে উঠছিল; অপর সকলের কিন্তু ততটা কিছু হচ্ছিল না কেন? তার শাশুড়ী যখন বাড়ী ঢুকলেন, নীলিমা তাঁকে প্রণাম করে উঠতেই, তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে মুখে মাথায় কতই না চুম খেলেন। তাঁর এই আকস্মিক আদরের কারণ কিছু সে খুঁজে পেলে না। তার মাও আজকাল যেন তার উপর একটু বিশেষ সদয় দৃষ্টি রেখেছেন। মাঝে মাঝে তাদের আত্মীয়ারাও সব তাদের বাসায় আসে তার খবর নিতে, সে যে হঠাৎ কিরূপে এরূপ দর্শনীয় পদার্থ হয়ে পড়ল, এটা কিছুতেই তার মাথায় ঢুকছিল না।

কিন্তু তার নিজের এসব কিছুই ভাল লাগছিল না, ক্রমশ যতই সে কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়ছিল, ততই তার মনে হচ্ছিল, সে যেন একটু একটু করে ধীরেশের সম্পূর্ণ তাঁবে গিয়ে পড়ছে। তার এই ভাবনা যত বেশী হয়ে উঠছিল, ততই তার বিষন্নতা বেড়ে উঠছিল; তার এত চেষ্টা, এত সাবধানতা সব বিফল হয়ে গেল। কিন্তু তার এই রকম ভাব দেখে বাড়ীর লোকেরা চিন্তিত হয়ে পড়ল। এই রকম ভাবে থেকে শেষে সে না একটা বিপদ্ ঘটায়। তার মা তাকে অনেক করে বুঝাতে লাগলেন, এখন একটু হাসি খেলা করে স্ফুর্ত্তিতে থাকতে হয়, তবে ত ভালয় ভালয় হবে। শাশুড়ীও ধমকে বকে যখন তার প্রফুল্লতা আনতে পারলেন না, তখন তিনি দোষ দিতে লাগলেন ধীরেশকে, সে কেন তার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করে না, নানা কথায় তাকে ভুলাতে চেষ্টা করে না।

ধীরেশও তাকে যথেষ্ট বুঝাতে চেষ্টা করলে, সে টাকা রোজগার না করতে পারলেও তাদের ছেলেকে মানুষ করবে। ঘর সংসার দেখতে যে পরিশ্রম সে করবে, সেটা কি টাকার সঙ্গে সমান নয়? তা হলেই ত তার খরচের অংশ দেওয়া হল; তবে তার জন্য মিথ্যা মাথা খারাপ করবার দরকার কি?

কিন্তু এসব কথা যাকে বুঝান হল তার কাণে যে সেগুলা ঢুকল এমন কিছু বোঝা গেলনা।

সকলকে নিশ্চিন্ত করে নির্ব্বিঘ্নে নীলিমার একটী পুত্র-সন্তান জন্মাল।

ঘটনার মাসখানেক আগে থেকেই নীলিমা শয্যাশায়ী হয়েছিল। শাশুড়ী সংসার দেখাশুনার ভার নিয়েছিলেন, ধীরেশ একাই সমস্ত খরচ চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তখন নীলিমা নিজের দেহ নিয়ে এমন কাতর হয়ে

পড়েছিল, যে এদিকে নজর দিতে একটুও পারছিল না। পুত্র ভূমিষ্ঠ হবার পরও সাত আট দিন তার বিশেষ কিছু জ্ঞান ছিল না, কিন্তু তার জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার পূর্ব্বের মত অধীর হয়ে পড়ল। সে ধরে বসল, এবার থেকে আগেকার মত সে কাজ করবে। শাশুড়ী বারণ করলেন, তার এরকম শরীরে পরিশ্রম করা উচিত নয়। ধীরেশ বুঝালে যে, খরচ যা হচ্ছে, এতেত তারও অধিকার আছে। কিন্তু নীলিমা কোন কথাই কাণে তুল্লে না। সে তার ঘরে, তার সেলাইয়ের কল, ছুরি কাঁচি নিয়ে গিয়ে কাজ করতে বসল।

কিন্তু কাজ আর এগোয় না, কাজে হাত দিতে না দিতেই ছেলে কাঁদে, কাজ ফেলে সে ছেলের কাছে যায়, মিনিট পনের পরে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে ফের কাজে বসতে আসে, তখন হয় সে নিজেই ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে, না হয় কাজ করতে করতে ছেলের দিকে মাঝে মাঝে তাকায়, কাজে ভুল হয়; সেগুলা ফেলে দিয়ে আবার নূতন করে কাজ ধরে। ফলে, নানা দিক থেকে নানা রকমের ক্ষতি হতে থাকে। কাজের পরিমাণ ঢের কমে যায়, তদনুপাতে আয়ও ঢের কম হয় বা একবারেই কিছু হয় না।

যত আয় কম হতে থাকে, নীলিমার কাজ করবার ঝোঁক ততই বেড়ে যায়; ফলে একদিন কাজ করতে করতে সে মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল। ডাক্তার এলেন, সব ব্যাপার শুনে প্রবীণ চিকিৎসক নীলিমাকে বেশ ধমক দিয়ে গেলেন, এখন মাসখানেক তার বিশ্রাম লওয়া দরকার, নচেৎ তার এমন একটা অসুখ হবে, যে তখন ছেলেকে বাঁচান দায় হবে।

ছেলের বিপদ হবে! সে ছেলেকে বুকের উপর আঁকড়ে ধরে।

ছ'মাস কেটে গেছে। ছেলে এখন একটু একটু হামা দিতে পারে।

মা কাজ করতে বসে, ছেলে পাশে ঘুমায়। ছেলের ঘুম ভাঙ্গলে, হামাগুড়ি দিয়ে মার কাছে আসে, তার কাপড় ধরে টানাটানি করে। ক্ষুদে ডাকাত জোর করে তাকে টেনে নিয়ে যায়, তারপর মাইটী মুখে দিয়ে সে বুকের উপর নিশ্চিন্ত হয়ে খেলা করে; মা ও ছেলের খেলায় হাতের কাজ মাটিতে পড়েই লুটায়।

খোকার একটা একটা দাঁত উঠ্‌ছে; জ্বর একদিনও ছেড়ে যায় না, তার উপর পেট গরম প্রভৃতি নানারূপ উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ডাক্তার বিশেষ সাবধানে থাকতে বলে গেছেন; ছেলের খাওয়া-দাওয়া যেন খুব সাবধানে হয়, মায়ের দুধ বন্ধ করে কেবল ফুড্‌ খাইয়ে রাখতে হবে।

ধীরেশের ডাক্তারবাড়ী যাওয়া—আসা করা একটা কাজ বেড়েছে; সে সংসারের অন্য কাজ কিছু করতে সময় পায় না। কিছুদিন আগে থেকে সংসারের খরচ চালাবার জন্য একটা ছবি আঁকা শেখাবার স্কুলে পড়াবার ভার সে নিয়েছে। সন্ধ্যার পর দুঘণ্টা সেখানে তাকে যেতে হয়; নানা কারণে সংসারের প্রায় সব কাজগুলাই নীলিমার উপর এসে পড়েছে।

শাশুড়ীকে আসবার জন্য চিঠি লিখেছিল, তিনি জানিয়েছেন, এই শীতে তার শ্বশুরের হাঁফানীটা খুব বেড়েছে, এখন তিনি তাঁকে ফেলে যেতে পারছেন না; কিন্তু খোকার খবর যেন তাঁকে রোজই পাঠান হয়। সংসারের কাজ আর খোকার সেবায় আজকাল তার দিনের প্রায় সমস্ত সময়টা কেটে যায়, বাদবাকী সময়টা খোকা তাকে ছাড়ে না, মাকে না দেখতে পেলে অস্থির হয়, সেটাও নীলিমার প্রাণে সহ্য হয় না।

এ ক' মাসে সেলাইয়ের বাক্সের চাবিটা আর রিং থেকে খোলা হয় নি, কাঁচিটাতেও প্রায় মরচে ধরে এল।

প্রায় চার পাঁচ মাস ভুগে খোকা সেরে উঠল। এই ক'মাস নীলিমার কোনও রোজগার ছিল না, ধীরেশ একাই সব খরচ চালিয়েছে। এর আগেও নীলিমার আয় অনেক কমে গিয়েছিল, তবু সে কিছু কিছু দিত, এখন আয় আর মোটেই নেই।

সে দিন রাত্রে ধীরেশ খাওয়া দাওয়ার পর ছেলেকে নিয়ে বিছানায় খেলা করছে, গরম ফুডের বাটী হাতে করে নীলিমা ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে ধীরেশ একটু ঠাট্টা করবার লোভ সামলাতে পারলে না। সে বল্লে, "আসুন, আসুন, বেগম সাহেবা।"

নীলিমা উত্তর দিলে, "বেগম সাহেব যুদ্ধে হেরে গেছেন, এখন তিনি শত্রুপক্ষের বন্দিনী, তারা তাকে বাঁদী করে রেখেছে যে।"

ধীরেশ বুঝতে পারলে নীলিমার ব্যথা কোথায়। সে বল্লে, "আর তার শত্রুরা যদি তাঁকে ছেড়ে দেয়; তাহলে তিনি কি তাঁর নিজের রাজ্যে ফিরে যাবেন?"

নীলিমা গাঢ় স্বরে বল্লে, "বেগম অনেক দিনই তার রাজ্যপাঠ উঠিয়ে দিয়ে এসেছে। এখন দেখ্‌ছে রাণীগিরির চেয়ে বাঁদীগিরির সুখ ঢের শান্তি অনেক বেশী; ছাড়া পেলেও সে ত আর ফিরে যাবে না।" সে তার প্রধান শত্রুকে কোলে করে চুমু দিতে দিতে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

শত্রুপক্ষের সেনাপতি বন্দিনীকে দুহাত দিয়ে বাঁধাতে গেল, কিন্তু বন্ধ দরজা তাকে বাধা দিলে।

প্রতীক্ষমানা ।

একই বাড়ীর উপর তলায় পাশাপাশি দুখানি ঘর। একখানিতে থাকত একটী ছেলে, বয়স তার ছাব্বিশ সাতাশ, সে আর্টস্কুলে পড়ে ও বাড়াতে ছবি আঁকে; তার পাশের ঘরেই ছিল একটী মেয়ে, সে থাকত তার বাপমার সঙ্গে, বয়স বোধ হয় চোদ্দ পনেরর কাছাকাছি। তারা ছিল খুবই গরীব আর মেয়েটির রং ও ছিল একটু ময়লা, সে জন্য তার বিয়ে আর এ পর্য্যন্ত ঘটে উঠে নি। সে বাড়ীতে গৃহস্থালির কাজকর্ম্মই নিয়েই থাকত আর সময় মত একটু একটু লেখাপড়ার চর্চ্চা করত।

দুজনের প্রায়ই দেখা হত যাতায়াতের রাস্তায়। মেয়েটি দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করত, "আজ কি আঁকলেন?" ছেলেটী তাকে ঘরে নিয়ে যেত সেদিনকার তার আঁকা ছবি দেখাতে। এই মেয়েটীই ছিল তরুণ শিল্পীর ভক্তদলের প্রধান। ছেলেটীর হাতে যেদিন আঁকবার বিশেষ কিছু থাকত না, সেদিন সে মেয়েটীকে খুঁজে নিয়ে আসত তার ঘরে, তার সঙ্গে গল্প কর্ত্তে; মাঝে মাঝে তাকে বসিয়ে তার ছবিও আঁকত সে।

ছেলেটী কাল বাড়ী যাবে, স্কুলে পূজার ছুটী হয়েছে, বাড়ী থেকে ডাকও এসেছে, সেখানে ফের্ব্বার। বাপ নাই, তিনি যখন মারা যান

ছেলেটী তখন নিতান্ত শিশু, তার মাই তাকে বড় করে তুলেছেন। তিনি থাকতেন দেশে, সেখান থেকে তিনি ছেলেটীর কলিকাতার খরচ পাঠাতেন। পূজায় তিনি ছেলেকে দেশে আসতে লিখেছেন, ছেলেটী সকালে উঠে সেই কথাই ভাবছিল। বাইরের আকাশের গায়ে শরতের ছাপ এর মধ্যেই লেগে গিয়েছে ; শাদা শাদা হাল্কা মেঘগুলা তার উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল, ছেলেটী সেই দিকে তাকিয়ে ছিল, আর ভাবছিল তার দেশের কথা ; ছাতের টবে শরতের কতকগুলা ফুল ফুটে রয়েছে, সকালের ঝিরঝিরে বাতাসের সঙ্গে সেগুলোও ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ছিল ; তার চোখের ঘুমটী যেন কিছুতেই ছাড়তে চাইছিল না। বিছানা ছেড়ে উঠবার উদ্যোগ তার মোটেই দেখা যাচ্ছিল না। সে চুপ করে তার বিছানায় পড়ে রইল। তাকে যে বাড়ী যেতে হবে, বাজারের জন্য তাগিদ আছে, সেটা সে সম্পূর্ণ ভুলেই গেল।

মেয়েটীর মা রান্নাঘরে কাজ করতে গিয়েছেন ; বাপও বাজার প্রভৃতি সংসারের কাজের জন্য বাহিরে গেছেন, মেয়েটি ছেলেটীর সঙ্গে একটু দেখা কর্ব্বার জন্য এইটাই উত্তম ফুরসুৎ মনে কর্লে। আহা, কাল যে সে এ বাড়ী থেকে চলে যাবে। কবে ফিরবে কেই বা জানে—আর সে যে এইখানেই ফিরছে অমন কথাই বা কে বলতে পারে—তার মনে হল তাকে বলবার, আর তার কাছ থেকে জানবারও অনেক কথাই তার জমা হয়ে আছে। সে আস্তে আস্তে তার ঘরের ভিতর ঢুকল।

ভেজান দরজা একটু ঠেলতেই খুলে গেল, সে দেখলে ছেলেটী তখনও বিছানায় শুয়ে। সে বল্লে, "এখনও বিছানা ছেড়ে উঠেন নি যে? কোন অসুখ করেছে নাকি?"

ছেলেটী উত্তর দিলে "কে, নীলা, এস। শরীরটা যত না হক মনটা তত ভাল ঠেকছে না।" সে উঠে চৌকির উপর বসলে, মেয়েটী তার চৌকির এক পাশে বসে পড়ল।

তাদের আলোচনা ছেলেটীর শরীরের বিষয় থেকে আরম্ভ করে নানা বিষয়েরই হল, কিন্তু মেয়েটী যে সব কথা মনে করে এসেছিল, তার কোন-টাও উত্থাপন করবার অবসর সে পেলে না। সে শুধু তাকিয়ে রইল ছেলেটীর মুখের দিকে—তার কুঞ্চিত লম্বা চুলগুলা কাঁধের উপর ঝুলে পড়েছে; ভ্রুর চুলও বেশ বড় বড় লম্বা হয়ে চোখের পাতার কাছাকাছি এসে পড়েছে, তার মধ্যে কাল কাল টানা চোখের তারা দুটী জ্বল জ্বল করছে, বোধ হয় কয়েক দিন সে কামায় নাই, মুখের উপর গোঁফদাড়িগুলাও খুব বেড়ে উঠেছে একি শোকের প্রতিমূর্ত্তি? মেয়েটী সেই কথাই ভাবছিল।

কিছুক্ষণ পরে ক্লান্ত হয়ে ছেলেটী চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল, মাথাটা তার মেয়েটীর এত কাছে এসে পড়ল যে তার নিশ্বাসগুলা মেয়েটীর আঁচল কাঁপিয়ে তুলছিল।

মেয়েটী হঠাৎ জিজ্ঞাসা কল্লে "মার এত তাগাদা কেন ছেলেকে দেশে নিয়ে যাবার জন্যে? কনে ঠিক করে রেখেছেন নাকি? গেলেই চার হাত এক করে দেবেন। আপনি এতক্ষণ সেই বৌয়ের কথাই ভাবছিলেন বুঝি?—আচ্ছা, আপনি আপনার কনেকে দেখেছেন?—সে কেমন দেখতে বলুন না? খুব সুন্দরী?—কাল মেয়ে আপনি বিয়ে কর্ত্তে পার্ব্বেন না কিন্তু। আচ্ছা, যখন ফিরবেন তখন বৌকে নিয়ে আসবেন?—আমায় আগে থেকে খবর দেবেন তা বলে, আমি আপনাদের ঘর গুছিয়ে রেখে দেব। আচ্ছা, কি দিয়ে আপনার বৌএর মুখ দেখব বলুন দেখি?"

ছেলেটী মেয়েটীর এই আচমকা এতগুলা প্রশ্নে বেশ থতমত খেয়ে গেল, তার কোন্‌টীর উত্তর আগে দেবে সেটাই সে বুঝতে পার্লে না। সে সে শুধু বল্লে, "তোমার সব কথা গুলাই বাজে, কারণ বিয়ে আমি কর্ব্ব না, তার কোন উদ্যোগ ও এখন কেউ কচ্ছে না, ভবিষ্যতে কর্ব্বেও না। মা আমার সব কথা জানেন, তিনি অনর্থক পরিশ্রম কর্ব্বেন না।"

মেয়েটী আশ্চর্য্যভাবে তাকিয়ে বল্লে, "বিয়ে কর্ব্বেন না—কেন বলুন ত?"

ছেলেটী বল্লে, "কারণ আমার এখন ততটা অবসর নেই। যারা শিল্পচর্চ্চাকে জীবনের ব্রত করে নিয়েছে, তাদের স্বাধীন থাকা খুবই দরকার—একটা বাধা জড়িয়ে পদে পদে বিব্রত হলে শিল্প সাধনা হয় না।"

মেয়েটীর সে আগেকার ভাব কেটে গেল, সে একটু রাগত ভাবেই বল্লে, "বলতে পারেন স্ত্রীরা কি রকমে তাদের স্বামীর সকল কর্ম্মে বাধা জন্মায়? আপনারা এমনি করে মেয়েদের দূরে দূরে ঠেলে রেখে তাদের ত কোন্‌ঠাসা করেছেনই, তারপর এই যে আপনাদের ক্রমাগত অকেজো, অপদার্থ, বাধা, ইত্যাদি চীৎকার, এখন আমাদের নিজেদের উপরই সন্দেহ হয় সত্যই কি আমরা তাই। কিন্তু সত্যই যে আমরা তা নই এটা আমিও যেমন জানি আপনিও তেমনি জানেন।"

ছেলেটী একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে "এ শুধু আমার একলার কথা হচ্চে, না, আমি সাধারণভাবেই কথাটা বলেছি, আর আমি নিজেও ঐভাবে থাকতে চাই। সফলতা, খ্যাতি, আমাদের লক্ষ্য, সে লক্ষ্য পথে অন্য কিছু বাজে জিনিষ এসে না দাঁড়ায়, এটা দেখে চল্‌তে হবে ত? সেইজন্য সাধারণের সঙ্গে শিল্পীর এত পার্থক্য।"

মেয়েটী তার কথার জবাবে ধীরভাবেই বলতে লাগল, "খ্যাতি হয়ত আপনি একদিন পাবেনই, সফলতাও হয়ত আপনার মুঠার মধ্যে এসে পড়বে, কিন্তু নারী জাতির প্রতি এই যে ঘৃণা, এই যে উপেক্ষা, সেটা যেন আপনার সব খ্যাতি, সব সফলতা নিরর্থক করে না দেয়, এর জন্য আমি নিয়তই ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্ব্ব। আচ্ছা—কালকেই তাহলে আপনি যাচ্চেন ?"

ছেলেটী বুঝতে পাল্লে সে এই আলোচনা আর বেশীদূর এগুতে দিতে চায় না। শেষের কথায় তার স্বর ভারী হয়ে উঠ্‌ছিল সেটাও সে লক্ষ্য করেছিল। সকাল থেকেই তার মনটা ভাল ছিল না, এ সব কথায় তার মনটা আরও যেন ব্যাকুল হয়ে উঠছিল, সেও এ আলোচনা বন্ধ করায় খানিকটা স্বস্তি অনুভব কল্লে। কাল সে বাড়ী যাবে—কত দিন পরে সে তার জন্মভূমিতে, তার মায়ের স্নেহময় কোলে ফিরে যাবে, সে চিন্তায় যতখানি তার উৎফুল্ল হওয়ার কথা, কই সে উল্লাস প্রাণে জাগ্‌ছে না কেন ? সে শুধু উত্তর দিল "হাঁ, কালকেই যাব মনে করেছি, তারপর দেখি কি হয়।"

মেয়েটীর মা নীচের রান্নাঘর থেকে মেয়েটাকে ডাকাডাকি কর্চ্ছিলেন, মেয়েটা কিছু না বলে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ছেলেটী তেমনি শুয়ে শুয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

তৃষ্ণায় তার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার শরীর এরূপ অবশ মনে হচ্ছিল যে সে মোটেই উঠতে পার্চ্ছিল না। সামনে চুরুটের বাক্স থেকে একটা চুরুট বার ক'রে, সে ধূমপান কর্ত্তে লাগল! বাহিরের দিকে অনেক-ক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর তার ক্লান্ত চোখ দুটা আপনি বন্ধ হয়ে গেল।

ছেলেটী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগল।

সে যেন দেখছিল তার আঁকা ছবিগুলি পৃথিবীর সকল দেশের প্রদর্শনীতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হচ্ছে ; প্রশংসার পর প্রশংসায় সাময়িক পত্রিকাগুলার পৃষ্ঠা ভরে উঠ্‌ছে। দেশে বিদেশে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে, তার আঁকা ছবি কিনিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র হয়ে রয়েছে, নীলামের ডাকে সর্ব্বোচ্চ দরে ছবিগুলি বিক্রীত হচ্ছে। বহুব্যয়ে কিনেও ক্রেতা নিজেকে ধন্য মনে কর্‌ছে।

সে দেখতে লাগল, প্রচুর খ্যাতি বিপুল ধনের অধীশ্বর সে, তার বাড়ীর আগাগোড়া বর্ত্তমান সৌখিন রুচি অনুযায়ী সজ্জিত, তার বৈঠকখানার চারিপাশে দেশের বহু বিখ্যাত ও মাননীয় ব্যক্তি দেখা করতে এসে তার অপেক্ষায় বসে আছে। কত সুন্দর সুন্দর নরনারীর সঙ্গে তাহার আলাপ পরিচয় হচ্ছে, কিন্তু সেই-ই আগেকার দেখা মেয়েটীকে যেমন তার ভাল লেগেছিল, এদের সেরূপ লাগে না কেন ?

তার এই স্বপ্নের জাল ছিন্ন হয়ে গেল ঠাকুরের ডাকে। তার খাওয়া শেষ হলে তবে ঠাকুরের ছুটী হবে, সে বাসায় ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

খাওয়া শেষ হলে, ছেলেটী গেল মেয়েটীর খোঁজে তার সঙ্গে গল্প করে এই দুপুরটা কাটাবার ইচ্ছায়। কিন্তু সে গিয়ে দেখলে মেয়েটী তাদের ঘরে তার মায়ের সঙ্গে কাঁথা সেলাই কচ্ছে। অগত্যা সে নিজের ঘরে ফিরে এসে কিছুক্ষণ নিজের কাজ কর্ব্বার চেষ্টা কর্লে, কিন্তু মাথাটার ভিতর দপ্‌দপ্‌ কর্ত্তে লাগল, বিছানার উপর শুয়ে পড়ল, কিছুক্ষনপরেই সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

তার মার পূর্ব্বে পানের দোকান ছিল।

মহিলা প্রেসের সৌজন্যে]

[১৬ পৃষ্ঠা।
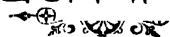
কতক্ষণ সে এমনিভাবে ঘুমিয়েছিল, সেটা সে একবারেই জানতে পারে নি। তারপর তার এক বন্ধুর ডাকাডাকিতে যখন তার ঘুম ভাঙ্গল তখন সন্ধ্যা উৎরে গিয়ে রাত্রির অন্ধকার পৃথিবীর উপর নেমে আস্ছে।

তার বন্ধুটীও চিত্রকর। এক স্কুলেই পড়ে। ছেলেটী আঁকত Portrait (প্রতিকৃতি) আর তার বন্ধুটী আঁকত Landscape (প্রকৃতির দৃশ্যাবলী) বন্ধুটী তাকে ঠেলা দিয়ে ডাক্ছিল—"কি রে কত ঘুমুচ্চিস্। সন্ধ্যে কখন হয়ে গেছে এখনও ঘুমুবি না কি? ওঠ্, কি কুম্ভকর্ণের ঘুম বাবা, আধ ঘণ্টার উপর গা ঠেলেও সাড়া নেই।"

ছেলেটী চোক রগড়াতে রগড়াতে উঠে বল্লে, "ওঃ, এতক্ষণ ঘুমিয়েছি। দাঁড়া, আলোটা জ্বালি।" সে আলোটা জ্বেলে দিলে, দুই বন্ধুতে চৌকির উপর বসলে ছেলেটী বল্লে, "তুই নাকি কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলি? কবে ফিরলি? কিছু আঁকলি নাকি?"

বন্ধুটী বল্লে, "হাঁ দিন কতক দিল্লী, আগরা সব ঘুরলুম। দু এক খানা আঁচড়ও কেটেছি বটে, তবে সে হাতটা নেহাৎ শুড়্ শুড়্ করে বলে। তারপর তোর কতদূর কি হল? নূতন কিছু ধরেছিস না কি?"

ছেলেটী বল্লে "একখানা আরম্ভ করেছি বটে, এখনও শেষ হয় নি। দেখবি?"—এই বলে ঘরের কোন থেকে একখানা অসমাপ্ত ছবি এনে তার হাতে দিয়ে বল্লে, "আমার 'প্রতীক্ষমানা', কেমন হয়েছে রে?"

ছবিতে একটী মেয়ে বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে আছে, তার খোলা আল্গা চুলগুলি হাওয়ায় উড়ে ঘাড়ের উপর চারিপাশে ছড়িয়ে পড়েছে, এক গোছা মুখের উপর এসে পড়েছে, কিন্তু মেয়েটী এত তন্ময় হয়ে রয়েছে, যে সেগুলি সরাবার কথাও তার মনে হচ্চে না, মাথার আঁচল

খসে কাঁধের উপর লুটিয়ে পড়েছে, চোখের কোণে দুফোঁটা জল জমা হওয়ায় চোখদুটী ফুলে উঠেছে, ঠোঁটদুটী কেঁপে ঈষৎ ফাঁক হয়ে গেছে, তার মধ্য দিয়ে শুভ্র দুপাটী দাঁত অল্প দেখা যাচ্ছে। দূরের গাছপালাগুলো সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, মেয়েটীরও মাত্র আবছায়া দেখা যাচ্ছে।

ছবিটীর অস্পষ্টতা যেন মেয়েটীর ব্যর্থতাকে ফুটিয়ে তুলেছিল।

একটু ভাল করে দেখেই বন্ধুটী বুঝতে পাল্লে যে, যে মেয়েটীকে প্রায় সিঁড়িতে উঠবার সময় দেখা যায় এই মেয়েটী সেই। কিন্তু মডেল সম্বন্ধে কোনও কথা তাকে জিজ্ঞাসা না করে, সে ছবিটীর সমালোচনা করে বল্লে, "হাঁ ছবির ভিতর ভাবটা একটু ফুটেছে বটে, তবে রংগুলা ঠিক মিলছে না ত; একটা অস্পষ্টতা দেখা যাচ্ছে কিন্তু অভাব হয়েছে প্রাণের —তুলির দোষ নানা জায়গায় রয়েছে—যাক্ শেষ হলে আর একবার দেখাস্।"

ঘর ছেড়ে দুই বন্ধুতে রাস্তার ধারে বাহিরের বারান্দায় এসে বসল। লম্বা বারান্দা, দোতলার সব ঘরগুলার সামনে দিয়ে গিয়েছে। দুখানা চেয়ার টেনে তারা এসে বসল ফাঁকা হাওয়ায়।

ছেলেটী বল্লে, "আমি মনে কর্‌ছি, এবার এমন একটা ছবি আঁকতে আরম্ভ কর্ব্ব যে তার সবটাই হবে নূতন। সেই নূতনত্বটুকুই হবে তার বিশেষত্ব আর প্রাণ; তাকে রং আর তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তুলব আমি।"

নীচে থেকে মেয়েটীর মা চেঁচিয়ে বলছিল, "হতভাগা মেয়ে এই ছিল এই খানে, এর মধ্যেই কোথা উঠে গেল। ওপর থেকে ফোড়নের কৌটটা যে নামিয়ে এনে আমার উপকার কর্ব্বে, সেটুকুও ও মেয়ের দ্বারা হবে না—একলা আমি মুখে রক্ত উঠে মর্‌ছি, পোড়ারমুখী মেয়ের সেদিকে যদি একটু হুঁস থাকে। মেয়ে যেন দিন দিন ধিঙ্গী হচ্চেন।"

দুই বন্ধুর গল্প চলছিল—এক জনের কথা শেষ হলেই, অপরটী তার কথা আরম্ভ করে—তারা বলছিল তাদের ভবিষ্যতের কথা—তারা শিল্পের ভিতর দিয়ে কে কি করবে—তারা দেশের ভিতর এমন একটা সাড়া এনে দেবে, এমন একটা চেতনা জাগিয়ে তুলবে, যেটা এখন দেশের লোকের মধ্যে দেখা যাচ্চে না, সেটা তারা ফুটিয়ে তুলবে—এমন একটা আদর্শ তারা দেশবাসীর সামনে খাড়া করে দেবে যে সেটাকে তারা আপনিই মেনে নিতে বাধ্য হবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তাদের তখনকার কথাবার্ত্তা শুনলে বাহিরে লোকেরা হয়ত মনে কর্ত্ত, তারা এর মধ্যেই এমন একটা কিছু করে ফেলেছে, আর ধন, সৌভাগ্য, খ্যাতি, সফলতা, সকলই তাদের এমন ভাবে পাওয়া হয়ে গেছে, যে তাদের ভবিষ্যতের গাঁথনিটা বেশ পাকা বোধ হয়। এই দুটী তরুণ যুবক তাদের উত্তেজনায় সম্পূর্ণ ভুলে গেল যে তারা এখনও শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষা এখনও সম্পুর্ণ হয় নি, তারা মাত্র সোপানের প্রথম ধাপে উঠেছে। কিন্তু উৎসাহে ও মোহে তারা সব ভুলে গিয়ে তখন ছুটেছিল ভবিষ্যতের দেশের দিকে, যেখানে আছে কেবল আশা, যে রাজ্যে কেবল স্বপ্ন, কেবল তৃপ্তি।

রাত্রি এগারটার সময় বন্ধু বিদায় নিয়ে বাড়ী গেল। তাকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে ছেলেটী নীচে গেল। দরজা বন্ধ করে উপরে উঠে ছেলেটীর গলা তৃষ্ণায় শুকিয়ে উঠেছিল, সে কুঁজো থেকে জল গড়াতে গিয়ে দেখলে তাতে জল নাই। ঠাকুর ঘরে ভাত চাপা দিয়ে নিজের বাসায় চলে গেছে, কিন্তু জল রেখে যায় নাই, তখনও কলে জল পাবে মনে করে সে নীচে নেমে গেল।

বাড়ীর সব আলোগুলো নিভে গেছে, একটা প্রকাণ্ড তারা তার সামনে দপ্ দপ্ করে জ্বলছিল, সেই আলোতে সে দেখতে পেলে সিঁড়ির কাছে কে যেন বসে আছে। সে ডাকলে "কে ওখানে?" জবাব এল "আমি"। সে আর একটু এগিয়ে দেখলে পাশের ঘরের মেয়েটা একলা বসে রয়েছে।

সে চুপ্ করে মেঝের উপর বসেছিল, তার কোলের উপর হাত দুটা মুঠো করা তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন কি ভাবছে। তাকে দেখে মেয়েটা উঠে এগিয়ে এল, কিছু ভূমিকা না করেই বল্লে, "আপনার সব কথাই আমি শুনেছি, কথাগুলা ভেবেছি ও। দেখলাম আপনাকে বড় হতেই হবে, আর সে ভার কতকটা—।"

ছেলেটা তার উত্তরে কিছু বলতে গিয়ে দেখলে মেয়েটার মুখে একটা দৃঢ়তার ভাব, সে কিছু না বলে মাথা নীচু করে রইল।

মেয়েটা বল্লে, "জল চাই—চলুন ঘর থেকে দিচ্ছি—খেতে বসবেন চলুন।" তাকে আগিয়ে দিয়ে সে ঘরের ভিতর চলে গেল।

নীচে থেকে মেয়েটার মা বকছিল, "ভাত নিয়ে এই রাত্তির অবধি আমি তোর জন্য বসে থাকতে পারি না আর। রাত দুপুর হয়ে গেল খেতে আসবার নাম নেই, খেয়ে আমার মাথা কিনবেন কিনা? আমার যেমন হয়েছে অধর্ম, তাই এই বুড়ো মেয়ের জন্য আমিত্তি কচ্ছে বাছ। রইল তোর ভাত ঢাকা, যখন ইচ্ছে হবে খেয়ে যাস—।"

হারাণ দিনের ব্যথায়।

(১)

সন্ধ্যার সময় 'নর্থ'থের বৈঠকখানায় আমাদের রোজকার মজলিস বসেছিল।

টেবিলের উপর সজোরে একটা চাপড় মেরে শিরীষ বল্লে, "আমাদের জীবনটা জ্যোৎস্না রাত্রের স্বপ্ন নয়, এটা মলয়ার হাওয়ায় তৈরী নয়, গোলাপের রঙ্গিন নেশা জমিয়েও এর গঠন হয় নি। জীবনটা একটা প্রকাণ্ড বাস্তব, যার মধ্যে আছে, কাজ আর কাজ; তারই ফাঁকে ক্ষণিক বিশ্রাম। সেটাও কেবল কাজের নূতন শক্তি সঞ্চয়ের জন্য। বন্ধু— Life is real; lite is earnest."

সমীর বল্লে, "ঠিকই ত, কাজ ত কর্ত্তেই হবে, যখন কাজগুলা পৃথিবীতে আছে, আর কাজ কর্ব্বার জন্য ভগবান আমাদের দুটো হাতও দিয়েছেন। তবে তুমিই স্বীকার কচ্চ যে কাজের ফাঁকে বিশ্রাম আছে। কিন্তু বিশ্রামটা কি রকম হবে বলতে পার?"

শিরীষ বল্লে, "হাঁ। খেটে খুটে এসে, দিব্বি হাত পা ছড়িয়ে চুরুট টানা! আর একখানা নভেল নিয়ে পড়া, তাও যদি নভেল পড়বার মত মনের অবস্থা থাকে; নচেৎ চক্ষু বুজে পড়ে থাকা। এর মধ্যে তোমরা romance ঢুকিয়েই যত না গোল বাধাও।"

সমীর উত্তরে বল্লে, "তাই ত আমরাও বলি। যখন তুমি চুরুট ফুঁকতে

থাক, তখন তোমার কানে না হয় একটু চুড়ীর ঠুনঠুনি গেল, সেটা পাখার বাতাস কর্ত্তে কর্ত্তেও ত আসতে পারে, তা থাকনা কেন তোমার ঘরে ইলেক্‌ট্রিকের পাখা; তোমার ইজি চেয়ারের হাতার উপর থেকে দুটা মিষ্টি কথাই হ'ল, তা সেটা গোয়ালার হিসাব বা মুদির দোকানের ফর্দ্দ, যা-ই হক্‌! দোকানে বরফ দেওয়া আইস্‌ক্রিম কিনতে পাওয়া যায় জানি, কিন্তু মিষ্টি হাতের মিছরির সরবৎ কেমন লাগে পরখ করে করে দেখলে ক্ষতি কি?"

শিরীষ বাধা দিয়ে বল্লে, "থাক, আর দরকার নাই। আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি। তুমি বলতে চাইছ ঠিক সেই সময়টাতে জানালার পাশ থেকে, অভাবে খাঁচার দাঁড় থেকে কোকিলটা ডেকে উঠল; দক্ষিন দিক থেকে মাতাল করা বাতাস বইতে লাগল, তা থাকি না কেন তোমার একতলা বাড়ী চেপে তিনতলা একটা বাড়ী; জানালার ফাঁক দিয়ে শুক্লপক্ষের চাঁদের আলো ঘরে এসে পড়্‌ছে; হাসনাহানা আর চামেলীর গন্ধে ঘরটা ভরিয়ে দিচ্ছে; যদিচ তোমার বাড়ীর দুই মাইলের মধ্যে কোন বাগান না থাকে, তা হলেও, এইত চাই হে?" বলে হো হো করে হেসে উঠল।

সমীর বল্লে, "না অতটা নয় জীবনটা ঠিক পুরা কবিতা না হলেও কিছু বটে।"

শিরীষ বল্লে, "এ কথাটা আমি অস্বীকার কখনও করি না, তবে আমার কথা হচ্ছে এগুলা বাড়তির ভাগ। জীবনের মধ্যে খুব বেশী প্রয়োজনীয় নয়; ওগুলা না হলেও জীবনের কিছু বিশৃঙ্খলতা হয় না বা চলবার পক্ষে কোনও অসুবিধা হয় না।"

নিশীথ এতক্ষণ ঘরের কোনে বসে এই সব তর্ক গুলা চুপ করে শুনছিল,

এবার হঠাৎ সে এগিয়ে এসে বলে উঠল, "না, না, এসব দরকার, বড়ই দরকার। জল, বাতাস, আলোর মতই দরকার।"

আমরা সকলে তার চাঞ্চল্য দেখে কিছু বিস্মিত হয়ে গেলুম। কিন্তু নিশীথ আপন মনেই বলে যেতে লাগল, "ভুল, সব ভুল শিরীষ। জীবনের মধ্যে এগুলা খুবই দরকারী। কিন্তু কেন যে দরকার সেইটাই সৃষ্টিকর্ত্তার রহস্য। কেন যে এতটুকুর ফাঁকে জীবন শূন্যতায় ভরে উঠে? চাই! চাই!! চাই!!! কি এ রাক্ষসী ক্ষুধা? অথচ এই চাওয়া আছে বলেই সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি টিকে আছে; সে আকর্ষণের মধ্যে কি ব্যাকুলতা; না পাওয়ার কি মর্ম্মভেদী হাহাকার!"

নিশীথের চোখগুলা উৎসাহে জ্বলে উঠতে লাগল। সমীর জিজ্ঞাসা কল্লে, "নিশীথদাদা কি বলছ?"

নিশীথ একটু থেমে দম নিয়ে বল্লে, "হাঁ, বলছিলুম এই যে, তুমি যাকে বৃথা ভাবছ, সত্য সত্য সেটা কিন্তু নিহাৎই বাজে নয়। কত জীবন এর আস্বাদন না পেয়ে তিক্ত হাহাকারে ভরে গেছে; সময়ে এর একটু অনুভূতি না পেয়ে, পরক্ষণেই, যখন পাবার আশা চলে যায়, তখন তার ছায়ার একটু স্পর্শ পাবার জন্য কত প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ছুটেছে! এর শিহরণ শিরায় শিরায়, এর আকর্ষণ শোণিতের প্রতি বিন্দুতে মিশান রয়েছে। একে কি এড়ান যায়?"

শিরীষ বল্লে, "তোমার হেঁয়ালীটা যদি পরিষ্কার করে বলতে, তা হলে হয়ত কিছু বুঝতে পারতুম।"

নিশীথ বল্লে, "কথা দিয়ে একে বুঝাতে যাওয়া বৃথা। তবে এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা যা আছে তা আমি তোমাদের বলতে রাজি আছি।"

সন্ধ্যাবেলায় বাজে তর্ক না করে, একটা গল্প শুনবার আশায় আমরা সকলে তাকে ঘিরে বসলাম।

নিশীথ বলতে লাগল :—

তখন আমি আদালতে সবে নতন বেরুচ্ছি। জুনিয়ার উকিলদের ভাগ্যে কাজ জোটে না মাসের মধ্যে উনত্রিশ দিন। সেদিন তখনও কোন মক্কেলের দর্শন পাই নাই। লাইব্রেরীতে খবরের কাগজখানা পড়ছিলাম। নূতন ইলেক্‌সন আসছে, গলাবাজীতে কে কত দেশ উদ্ধার কর্বেন তারই লম্বা লম্বা ফিরিস্তি এক একজন দিচ্চেন ; তার উপর চোখ বুলাচ্ছি আর দরজার দিকে নজর দিচ্চি, এমন মৃন্ময় দ্বিজেন এসে কাগজখানা কেড়ে নিয়ে বল্লে "রাখ বাপু তোর ইলেক্‌সন, নীচের কোর্টে একটা বেশ মজার কেস্ আছে, দেখবি ত আয় ; মকদ্দমার ডাক হল বোধ হয় এতক্ষণ, চ।"

বেশী কিছু বলা বৃথা, হতভাগা যখন এসেছে তখন নিয়ে যাবেই। উঠে তার সঙ্গে গেলুম।

অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে মামলা। আসামী দুজন ; একজন পুরুষ, অপরটি স্ত্রীলোক। পুরুষটির ইংরাজী পোষাক, স্ত্রীলোকটি একটি কাল চওড়াপাড় সাড়ী ও ফেশনেবল জ্যাকেট পরেছিল। দুজনেরই বয়স চল্লিশ পার হয়ে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় প্রায় পৌছায় পৌছায় হয়েছে। শরীরের উপর বয়সের ছাপ পড়তে আরম্ভ হয়েছে, দেহ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। স্ত্রীলোকটি মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে নাক মুছছিল, পুরুষটি গম্ভীর ভাবে জানালার ফাঁক দিয়ে অশ্বত্থ গাছের উপর যে কাকটা "কা কা" করে চ্যাচাচ্ছিল, তার দিকে তাকিয়ে ছিল আর যখন মাঝে মাঝে

স্ত্রীলোকটি চেঁচিয়ে ফুঁফিয়ে উঠছিল, তখন তার দিকে তাকাচ্ছিল, সেটা বিরক্তিতে কি ঘৃণায়, তা বুঝা যাচ্ছিল না।

কোর্ট-ইন্সপেক্টর হাত-মুখ নেড়ে গলা ফুলিয়ে আসামীর দোষটা প্রতিপন্ন কর্ব্বার জন্য যা বল্লেন তার মোটামুটি ভাব এই, গত রবিবার দিন সন্ধ্যার পর ১নং আসামী (পুরুষটা) ২নং আসামী ঐ স্ত্রীলোকটির সঙ্গে বোট্যানিক্যাল গার্ডেনের ধারে যে ভাবে শয়ান ছিল সেটা নাকি আইনের চোখে দোষণীয়। একজন মালি তাহাদিগকে দেখিতে পায় ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জানায়। তিনি তাহাদিগকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করেন। উকিল মহাশয় নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির অনেক দোহাই দিয়ে ও আইনের নজির দিয়ে হাকিমকে বেশ বুঝিয়ে দিলেন যে আসামীদ্বয় দোষী ও শাস্তির যোগ্য। মালী, বাগানের অধ্যক্ষ ও বীটের পুলিশ সকলেরই সাক্ষ্য গ্রহণ করা হল। আমরা সকলেই বুঝিলাম আসামীদের শাস্তি অনিবার্য্য। ইন্সপেক্টর যখন অপরাধের বর্ণনা করছিলেন তখন কোর্টের মধ্যে একটা চাপা হাঁসি শুনা যাচ্ছিল।

প্রথম আসামী ঠিক সেই রকম গম্ভীর নিশ্চল ভাবে বসে রইল, স্ত্রীলোকটির ফোঁপানিটা একটু দ্রুত হয়ে উঠল।

আসামীদের কোন উকিল ছিল না। হাকিম তাহাদের সে কথা জিজ্ঞাসা কর্লে, পুরুষটি উত্তর দিলে, "হুজুর সত্য কথাই বলব, তার জন্য একটা উকিল দিয়ে কতকগুলা মিথ্যা বলে লাভ কি? আমার যা বলবার আছে তা বলব এবং অসত্য বা অতিরঞ্জিত কিছু বলব না। হুজুর দয়া করে শুনলে বাধিত হ'ব।"

(২)

আমার নাম জন্ স্যামুয়েল ঘোষ। বয়স ৪৫ বৎসর, জাতী ক্রীশ্চান, সওদাগরী অফিসে কাজ করি। আমার স্ত্রীর নাম মেরী (দ্বিতীয় আসামী)। আমাদের বিবাহ হয় প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে। আমাদের সন্তান পাঁচটি, তাহার মধ্যে দুইটী মৃত, এখন তিনটি জীবিত: বড়টি কন্যা, নাম লুইসা, Junior Camdridge (জুনিয়ার কেম্ব্রিজ) পাশ করেছে, বয়স আঠার। তার পরেরটি ফেণী বা ফ্যান্টাইন; দার্জ্জিলিং-এর স্কুলে পড়ে। হাঁ, লুইসা এখন ডন্‌রাইট্ কোম্পানির আফিসে টাইপিষ্ট।

ডিক্ পাশের বাড়ীর ছোকরা। খুব সচ্চরিত্র এবং পরিশ্রমী, ভাল চাকরী করে, লুইসাকে ভালবাসে। জুন মাসে তাদের এনগেজমেণ্ট হয়ে গেছে, এই ডিসেম্বরে তাদের বিয়েটা হবে। তাদের আলাপ পরিচয়টা প্রায় দুই বৎসরের উপর। ভবিষ্যৎ সংসারের জন্য এখন তারা টাকা কিছু কিছু জমাচ্ছে। কিছু টাকা হাতে হলেই বিয়ে করবে, তার আগে নয়। ডিক্ রোজই আফিসের ফেরৎ আমাদের বাড়ীতে সন্ধ্যার মজলিসে যোগ দেয় ও লুসীর সঙ্গে গল্প করে। কোনও দিন বা দুজনে বেড়াতে বা বায়স্কোপ দেখতে যায়; আমরা এতে কেউ বাধা দিই না, বরং যাতে তারা এ রকম অবাধে মেলা মেশায় পরস্পরকে চিনিতে পারে, সে অবসর আমরা তাদের যথেষ্ট দেই।

কিন্তু মুস্কিল হল আমার স্ত্রীকে নিয়ে। একটা জিনিষ আমি প্রায়ই লক্ষ্য কর্ত্তাম যে, সে যেন একটু বিমর্ষ ও একটু শুকনো হয়ে আসছে। যখন ডিক্ ও লুসী ঘরের ধারে বসে কথা কইত, সে তখন প্রায়ই আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসত ও অসম্ভব চঞ্চল হয়ে উঠত। সে আগে খুব বেশী কথা কইত, আজকাল প্রায় সে কথাই কইত না। সদাই গম্ভীর, কি যেন একটা সে ভাবত। আরও একটা জিনিয আমি লক্ষ্য কর্ল্লাম যে সে ডিক্ ও লুইসা বাহিরে বেরিয়ে গেলে প্রায়ই তাদের দুজনার দিকে তাকিয়ে থাকত যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তারা দৃষ্টির বাহিরে চলে যেত। প্রথম প্রথম আমি মনে কর্ত্তাম বুঝি মেয়ের দিকে নজর রাখ্‌ছে, এবং এটা মায়ের কর্ত্তব্য মনে করে আমি ওদিকে বেশী খেয়াল করি নি; কিন্তু প্রায়ই তাকে ওরকম করে থাকতে দেখে, একদিন কারণ জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম। সে উত্তর দিলে "এমনি, বিশেষ কি কারণ থাকতে পারে?" কথাটা সে চাপা দিয়ে গেল দেখে আমি তাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম, "তোমার কিছু অসুখ কচ্ছে? তুমি এমন শুকনো হয়ে যাচ্ছ কেন?"

সে হেসে বল্লে, "বাঃরে, আমার আবার কি হবে, তুমি বেশ ত?" এ বিষয়ে বিশেষ কিছু কথা আর হ'ল না।

একদিন হঠাৎ সে বল্লে, "চল আজ বায়স্কোপ দেখে আসি।"

আমি বল্লাম, "লুসী কাজ থেকে ফিরুক, তাকেও নিয়ে যেতে হবে ত?" সে বলে উঠল, "না! না! সে থাক্, ডিক্ এসে তাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে, চল তোমাতে আমাতেই যাই।"

তাই যাওয়া হল। বায়স্কোপের আলোগুলা যখন নিভে গেল, তখন সে আমার ডান হাতটা চেপে ধর্ল্লে। আমি জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম, "কি হয়েছে?

ভয় পাচ্ছ না কি ?" সে বল্লে, "কিছু না, এমনি।" বলেই আমার হাতটা ছেড়ে দিলে। অন্ধকারে তার মুখটা দেখা গেল না।

দুদিন পরে সকালে আফিস যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি হঠাৎ সে বল্লে, "দেখ, আজ আর আফিসে নাই বা গেলে।"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্লাম, "সে কি, আফিস যাব না ?"

সে বল্লে, "না। আজ আর আফিসে গিয়ে কাজ নেই" বলে কোনও উত্তরের অপেক্ষা না করেই আমার কোটটা খুলে নিয়ে গেল। আমি হতাশ হয়ে খবরের কাগজটা নিয়ে, ঘরে গিয়ে দিবানিদ্রার আশায় শুয়ে পড়লাম।

তখন প্রায় বেলা তিনটা, ঘুমটা সবে মাত্র ভেঙ্গেছে, বেশ ভাল রকম ঘোরটা কাটে নাই, বাহিরের ঘর থেকে পিয়ানো বাজানার শব্দ শুনা গেল। কে, মেরী বাজাচ্ছে ? এতদিন পরে আজ হঠাৎ।

আমি উঠে গিয়ে বন্ধ জানালাটা খুলে দিলাম। মেরী সে শব্দ পেয়েই পাশের ঘর থেকে বলে উঠল, "জন, তুমি উঠেছ না কি ? একবার এঘরে আসবে ?"

আমি সে ঘরে যেতেই মেরী বল্লে, "জন, আমার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার গৎগুলা দয়া করে উল্টে দেবে ?"

আমি বল্লাম, "কি ছেলেমানুষী কর্চ্ছ, মেরী ?"

তার উত্তরে সে বল্লে, "আঃ, দাও-ই-না। আমার দুহাত জোড়া দেখতে পাচ্ছ না ? উল্টে না হয় দিলেই। আর দিতে কি নাই ?"

আমি আর কিছু না বলে তার পিঠের পাশে দাঁড়িয়ে পাতা উল্টাতে লাগলুম। মেরীও খুব স্ফূর্ত্তিতে বাজিয়ে যেতে লাগল।

বিকালের দিকে সে বল্লে, চল, "একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।" বেড়াতে বেরিয়ে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম, যে তার মাথায় টুপী নাই, চুলগুলা আল্গা করে বাঁধা, আল্গা চুল দু'একটা তার মুখের উপর এসে পড়েছে। তার মুখের দিকে আমি তাকিয়ে আছি দেখে সে হেঁসে বল্লে, "কি হাঁ করে তাকিয়ে আছ রাস্তার মাঝখানে ; আমায় কি কখনও দেখনি ?" সে হেঁসে ঘাড়টা একটু ফিরিয়ে নিলে। অনেকদিন পরে এই তার প্রথম হাসি। সে দিন তার সব ব্যবহারই আমার কাছে কেমন একটু নূতন ঠেকছিল।

তারপর আর একদিন সেদিন ছিল রবিবার, দুপুরে সে বল্লে, "আমি ঠিক করেছি আজ বিকালে বোটানিকাল গার্ডেনে বেড়াতে যাব, তুমি তৈরী হয়ে থেকো।" কিন্তু বিকালে দেখি ডিক্ লুসীকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মেরিকে জিজ্ঞাসা কর্লাম, "ওরা কি আমাদের সঙ্গে যাবে না ?"

মেরী উত্তরে বল্লে, "না, প্যালেসে আজ একটা ভাল ছবি আছে, ডিক্ লুসীকে নিয়ে সেইখানেই যাচ্ছে। কেবল তোমাতে আমাতেই যাব।"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই আমরা বাগানে গিয়া পৌঁছালাম। এদিক ওদিক বেড়াতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। শুক্লপক্ষের চাঁদ দেখা দিল। জ্যোৎস্নায় বাগান ভরে উঠ্ল। মেরী বল্লে, "এখানে বড় গরম হচ্ছে, চল গঙ্গার ধারে একটু বসিগে।"

আমরা যে ধারটায় বসেছিলাম সেটা বাগানের একটা কোণেরদিক, বেশ নির্জ্জন। একটা হাসনাহানার গাছ প্রকাণ্ড ঝাড় বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। তার পাশেই আমরা বসলাম। ক্লান্তিতে ক্রমে আমার শরীর এলিয়ে পড়ল, আমি হাসনাহানার তলায় শুয়ে পড়লাম। গঙ্গার ঝিরঝিরে বাতাস, হাসনার উগ্র গন্ধ, চাঁদের আলো, সবগুলা মিলে বেশ একটু গোলাপী

নেশা জমিয়ে তুলেছিল। চোখদুটি ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ কিসের ধাক্কায় তন্দ্রাটা ছুটে গেল। চেয়ে দেখি মেরি প্রায় আমার বুকের উপর এসে পড়েছে, সে হাঁপাচ্ছে। তারপর যা ঘটেছিল—আর আমার কিছু বলবার নেই হুজুর।

••

একটু আগে কোর্টের মধ্যে যে চাপা হাসির মৃদু গুঞ্জন উঠছিল, সেটা তখন সম্পূর্ণ থেমে গিয়েছিল। কোনখানেও একটু শব্দ ছিল না, কেবল থেকে থেকে মেরীর ফোঁপানি শুনা যাচ্ছিল।

হাকিম মেরীকে জিজ্ঞাসা কর্লেন তার কিছু বলবার আছে কিনা। মেরী বল্লে, "হুজুর! বলবার অনেক কথাই আছে, তবে মুস্কিল এই যে সব বলা যায় না, গোটাকত কথা বলতে চাই, হুজুর শুনে সুবিচার কর্বেন।"

"আমাদের যখন বিবাহ হয় সে প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে; স্বামের বা আমার বিবাহের পূর্ব্বে বিশেষ কিছু সংস্থান ছিল না। বিবাহের পর সংসার হল, সে সংসার প্রতিপালন কর্ত্তে আমাদের দুজনকেই খুব পরিশ্রম কর্ত্তে হত। নিজেদের সামলে উঠবার পূর্ব্বেই দেখি যৌবন কোন্ ফাঁকে পালিয়ে গেছে, আমরা প্রৌঢ়ত্বের ও বার্দ্ধক্যের মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছি। ব্যর্থতার হাহাকারে বুক ভরে উঠল। এই ক্ষুদ্র জীবন, তার মধ্যে কুড়িটা বৎসর বৃথায়ই কেটে গেল। যা হারিয়েছি, তা ফিরিয়ে পাবার কোন আশা নেই; তাকে ফিরিয়ে আনার—" আর কিছু সে বলতে পার্লে না। ক্ষোভে তার গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল।

কোর্টইন্সপেক্টর সাহেব বেশ করে হাকিমকে বুঝাতে চেষ্টা কল্লেন যে, আসামীরা যখন নিজেরাই দোষ স্বীকার কর্চ্ছে, তখন তাদের শাস্তি হওয়া উচিত, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিন্তু প্রৌঢ় হাকিমের দৃষ্টি তার দিকেই ছিল না, তিনি তাঁর কোন কথার জবাব দিলেন না। কিছুক্ষণ ভেবে রায় দিলেন—"আসামীরা নিরপরাধ।"

নিশীথের কথা যখন শেষ হ'ল তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। এতক্ষণ আমরা সকলে চুপ করে তার গল্প শুনছিলাম। সময়ের দিকে খেয়ালই ছিল না। শিরীষ বল্লে, "তোমার গল্পে এক প্রৌঢ়া নারীর ছ্যাবলামী ছাড়া আর বিশেষ কিছু বুঝলাম না।"

সমীর বল্লে, "তোমার মত গদ্দভে তার বেশী কিছু বুঝবেও না; আর এ সব বিষয় বুঝবার চেষ্টা করে মিছামিছি মাথাটা নষ্ট করো না।"

নিশীথ তাদের কোন কথার জবাব দিলে না। তার চোখের কোণটি চক্‌চক্ করছিল। তাকে বিরক্ত কর্ত্তে আর সাহস হ'ল না। কোনরূপ বিদায় না নিয়ে নিঃশব্দে আমরা তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। অত রাত্রিতে ট্রাম না পাওয়ায় সারা রাস্তাটা হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী ফিরিলাম।

স্বাধীনতার মূল্য।

(ক)

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শরতের অপরাহ্নে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার দিকে বড় রাস্তার ধারে কতকগুলা ঝোপের আড়ালে একজন সৈনিক ঘুমাচ্ছিল। সোজা উবুড় হয়ে ঘাসের উপর পায়ের আঙ্গুল গুলার উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে সে শুয়েছিল, আর তার মাথাটা ছিল তার বাঁহাতের উপর। ডান হাতটা স পাশে ছড়িয়ে দিয়েছিল। হাতের বন্দুকটা খুব আলা ভাবেই হাতের পাশে ঝুলছিল। প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে তার সমস্ত দেহটা অল্প অল্প যা একটু কেঁপে উঠছিল, তাতেই বুঝা যাচ্ছিল যে সে জীবিত।

সেদিন ভোরে তার পাহারার পালা পড়েছিল সেই রাস্তার উপর, আর সে এসেছিলও সূর্য্যোদয়ের অনেক আগেই। সেই রাস্তার উপর বসেই সে তার মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করেছিল, তারপর সমস্ত দিন প্রখর সূর্য্যের তাপ তার পিঠের উপর দিয়ে গেছে, বৈকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার ক্লান্ত চোখ দুটী আপনি যে কখন বন্ধ হয়ে গেছে, সেটা সে মোটেই জানতে পারেনি। সে বেশ ভাল রকমই জানত যদি সে ঘুমন্ত অবস্থায় কোনও উপরস্থ কর্ম্মচারীর চোখে পড়ে তবে তার এ অপরাধের শাস্তি মৃত্যু, তবুও সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে ঘুমকে বাধা দিতে পারলে না।

বড় রাস্তার বাঁকের মুখেই একটা ঝোপের পাশে সে শুয়েছিল। রাস্তাটা শ'গজটাক গিয়ে হঠাৎ খানিকটা সোজা, তারপর আবার খানিকটা ঢালু গড়ানে, এই রকম ভাবে বরাবর রাস্তাটা জঙ্গলের পাশে পাশে গিয়েছিল। ঝোপের ঠিক পাশেই, রাস্তার মোড়টার উপর একখানা প্রকাণ্ড বড় পাথর ছিল। সেটার খানিকটা পাহাড় থেকে বেরিয়ে শূন্যের উপর মাটী থেকে প্রায় হাজার ফিট উপরে ঝুলছিল। আর সে জায়গাটা পাহাড়ের অন্য জায়গাগুলার চেয়ে একটু উঁচু থাকায়, সেখান থেকে পাহাড়ের চারিদিক বেশ স্পষ্ট দেখা যেত।

পাহাড়ের নীচেকার আশে পাশের সব জায়গাটাই ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। কেবল উত্তর দিকটায় ঘাসে ভরা খানিকটা জমী ছিল, সেই জমাটার পাশ দিয়ে একটা সরু নদী ঝির ঝির করে বয়ে যাচ্ছিল! নদীটা এত সরু যে দূর থেকে তার অস্তিত্ব প্রায় বোঝা যায় না। এই নদীটার অপর পারেই কতকগুলা ছোট ছোট পাহাড় সারি সারি সোজা উঠেছিল, আর বড় রাস্তাটা ঘুরে ঘুরে ঐ সব পাহাড়ের গা দিয়ে চলে গিয়েছিল। পাহাড়গুলা চারিদিক থেকে সেই উপত্যকাটীকে এমন ভাবে ঘিরে ছিল যে, মনে হচ্ছিল সেটা বুঝি সব দিক দিয়েই বাহিরের থেকে বন্ধ। উপত্যকায় ঢুকবার বা বাহির হবার যে একটা পথ আছে, এটা প্রথম দৃষ্টিতে মনে হত না। বড় রাস্তাটা আর ঐ সরু নদীটা কোথা দিয়ে যে তার ভিতর ঢুকে পড়েছে এবং কোন দিক দিয়েই বেরিয়ে গেছে, এটা সাধারণতঃ সকলেরই কাছে একটা হেঁয়ালী রয়ে গিয়েছিল।

যুদ্ধের উপযুক্ত বোধ হয় এর চেয়ে ভাল জায়গা ঐ দেশেতে আর ছিল না। ঘন জঙ্গলের ভিতর লুকিয়ে প্রায় জন পঞ্চাশেক মাত্র সৈন্যের

সাহায্যে একটা বিপুল বাহিনীর পথ রোধ করা যায়—পাশে পাশে থাকে থাকে খুব অল্প লোক দিয়ে খাঁচায় পোরা ইন্দুরের মত শত্রুকে ধ্বংস করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

এই জঙ্গলের মধ্যে জাতিয় দলের সৈন্যদল এসে তাঁবু গেড়ে শত্রুর আগমনের প্রতীক্ষায় ওত্ পেতে বসেছিল। তারা ক্রমাগত তিন দিন ও দুই রাত্রি কুচ্ করে এসে যখন জঙ্গলের ভিতর ঢুকল, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর পার হয়ে গেছে। ক্লান্ত সৈনিকের দল বিশ্রামের জন্য সেই খানেই থেমে পড়ল।

জঙ্গলের অপর ধারে রাজসৈন্য ছাউনি ফেলে ছিল। দুই দলেরই লক্ষ্য কে আগে পর্ব্বতের শীর্ষে উঠিতে পারে। যে আগে শীর্ষ অধিকার করিবে, জয় তার অনিবার্য্য। কিন্তু এরূপ স্থলে পরাজয় অর্থে মৃত্যু। পশ্চাৎ হইতে সাহায্য পাইবার আশা মোটেই ছিল না, পশ্চাদ্বর্ত্তনেরও উপযুক্ত স্থান নাই। পাহাড়গুলা সে পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। একমাত্র ভরসাস্থল বড় রাস্তাটা। সেইজন্য রাস্তার উপর পাহারা দিবার জন্য জাতীয় দলের বিশেষ চেষ্টা ও বন্দোবস্ত ছিল।

(খ)

রসিদ বেগ ইস্পাহান সহরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী মির্জ্জা হামিদ বেগের একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী। ধনী পিতার একমাত্র সন্তান রসিদ চিরকাল সুখে এবং স্বচ্ছন্দেই প্রতিপালিত হইয়াছিল। তার চলন এবং তার বাবুগিরি সারা ইস্পাহানের মধ্যে বিশেষ একটা আলোচনার বিষয় ছিল। শিকার ও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সে অনেকবারই তিহারাণের আশে পাশের পাহাড়ে ও জঙ্গলে বেড়াইতে আসিত।

বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে যখন জাতীয় দল বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, সেই সময়ে একদিন সকালে প্রাতর্ভোজন শেষ করে, সকলে যখন বিশ্রাম কচ্ছিল, রসিদ বল্লে, "বাবা, জাতীয় দল বোলান গ্রামে এসে ছাউনি ফেলেছে। আমি সেখানে আজই চলে যাচ্ছি।"

বৃদ্ধ হামিদ তাঁর তামাকের গড়গড়ায় একটা টান দিয়ে মাথাটা একটু নীচু করে বল্লেন, "আজই যাচ্ছ?—আচ্ছা যাও।" তিনি রসিদের মনের ভাব আগে থেকেই জান্তেন, তাঁর ছেলে যে রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী নয়, এটা তিনি অনেক দিনই বুঝেছিলেন, কিন্তু তিনি তার স্বাধীন মতকে কোন দিনই বাধা দেন নাই। আজ রসিদের কথা শুনে তিনি একটুও বিস্মিত হলেন না—তবুও বুকের মধ্যে কি যেন একটা ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠছিল, কিন্তু বাহিরে সেটার কিছুই বুঝ্তে দিলেন না, কিছুক্ষণ পরে রসিদের দিকে তাকিয়ে তিনি বল্লেন, "কিন্তু একটা কথা মনে রেখ, যাহাই কেন ঘটুক না, সৈনিকের একমাত্র লক্ষ্য—কর্ত্তব্য। পারস্য সম্রাটের তোমাকে না হলেও চলবে। আচ্ছা, বিদায়—এই যুদ্ধের পর যদি আমরা উভয়ে বেঁচে থাকি তা হলে আবার দেখা হবে। যাক্, একটা বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পার, আজ হকিম সাহেব বলে গেলেন, তোমার মার আর বড় বেশী দেরী নেই—বড় জোর দু'দিন কি তিনদিন। কিন্তু আমার ইচ্ছা এই যে এ কটা দিন যেন তুমি তাঁকে আর বিরক্ত ক'রো না। আচ্ছা এখন তুমি যেতে পার।" তিনি ছেলের দিকে তাঁর দক্ষিণ হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

রসিদ নত মস্তকে বৃদ্ধের হাতটা তার মাথার উপর চেপে ধরে তাঁর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা কল্লে, তার হাতটা ছাড়তে মিনিট কতক দেরী হল। বৃদ্ধ

তাকে টেনে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু দু'জনের চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। তারপর দুজনে দুজনের নিকট বিদায় নিয়ে সোজা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখের জল তখন শুকিয়ে গিয়েছে। ভবিষ্যৎ সংগ্রামের ঔৎসুক্যে তাদের চোখগুলা জ্বলে উঠল—যুদ্ধ! যুদ্ধ!!—বীর তারা, এ অধীরতা কি তাদের মানায়? তারা দু'জনে সোজা দাঁড়িয়ে পরস্পরকে অভিবাদন করলে, তারপর রসিদ দ্রুত নীচে নেমে গেল।

রসিদ তার বুদ্ধি ও সাহসের দ্বারা শীঘ্রই তার উপরস্থ কর্ম্মচারীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, সে তার সঙ্গীদের চেয়ে শীঘ্র অনেক উঁচুতে উঠে গেল এবং সেই তাদের মুরুব্বী হয়ে দাঁড়াল। তিহারাণের উপত্যকার পথ—ঘাট তার যেমন পরিচিত ছিল, তাদের দলের অন্য কাহারও সে রকম ছিল না, সেজন্য পাহারার ভার সেদিন পড়েছিল তারই উপর।

(গ)

রসিদ ঘুমাচ্ছিল, পরিশ্রান্ত অবশ দেহে নিদ্রার মোহিনী মায়া একটু একটু করে তাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙ্গে গেল; কিন্তু কে তাকে জাগালে? অদৃষ্টের কোন্ গ্রহদেবতা তাকে তার সুষুপ্তির কোল থেকে টেনে তুলে দিলে? সে কি সুগ্রহ, না কুগ্রহ? কে জানে। কোন এক অদৃশ্য শক্তি তার মাঢ় আঙ্গুল বুলিয়ে দিলে তার চোখের পাতার উপর যে তার চোখ দুটী ধীরে ধীরে খুলে গেল; কোনরূপ শব্দ না করে, একটুও অঙ্গ সঞ্চালন না করেই সে জেগে উঠল। তারপর আস্তে আস্তে সে তার মাথাটা হাতের উপর একটু তুলে।

ঝোপের ভিতর দিয়ে সামনের দিকে তাকালে। অভ্যাসের দোষেই বোধ হয় পাশের শোয়ান বন্দুকটা সে ডান হাতে চেপে ধরলে।

প্রকৃতির সে কি মধুর মূর্ত্তি—পরিষ্কার নীল আকাশ, দূরে দূরে ধোঁয়ার মত আবছায়া পাহাড়গুলা, নীচে সবুজ মাঠ, বনের ঝোপে ফোটা টাটকা ফুলের গন্ধ, কাঁচ ঘাসের একটা মিষ্টি আবেশ, সবগুলা মিশে তাকে বেশ খানিকটা স্ফূর্ত্তি এনে দিলে। প্রথমটা তার মনটা আনন্দে খুব নেচে উঠল। কিন্তু পরক্ষনেই তার মনের ভিতর কেমন একটা আতঙ্ক এসে পড়ল—ঠিক তার সামনে আকাশের গায়ে ঠিক যেন একটা পাথরের কোঁদা মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রাস্তার ধারের বড় পাথরটার উপর একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আর তার উপর একজন আরোহী। আরোহীর পরিচ্ছদ দেখে বুঝা যাচ্ছিল যে তিনি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। তাঁর ধূসরবর্ণ আল্লা পোষাকটা সাদা ঘোড়ার পিঠের উপর ঝুলছিল এবং যখন সেটা মাঝে মাঝে হাওয়ায় উড়ছিল, তখন নীল আকাশের পাশে তাকে এত চমৎকার দেখাচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন একজন গ্রীক ভাস্কর সেখানে সেই যোদ্ধার প্রতিমূর্ত্তিটী এঁকে রেখে গেছেন। তিনি ডান হাতে রেকাবের পাশে লম্বমান ছোট তরবারীর হাতলটা ধরেছিলেন, আর বাঁ হাতে ঘোড়ার লাগামটা কসে টেনে ধরে-ছিলেন, যেন ঘোড়াটার নীচের দিকে লাফ দেওয়াটা তিনি আটকে রেখেছেন। মুখটা তিনি ফিরিয়েছিলেন নীচের উপত্যকার দিকে, সেজন্য রসিদ তাঁর মুখটা বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না, কেবল তার কপালের এক পাশটা, আর সাদা ধবধবে দাড়ির খানিকটা মাত্র দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু তার অনাবৃত মস্তকের শুভ্র লম্বা কুঞ্চিত চুলগুলা যখন হাওয়ায়

উড়ছিল, তখন মনে হচ্ছিল যেন সেগুলা তাঁর শিরস্ত্রাণেরই গুচ্ছ গুচ্ছ শ্বেতপালক। তাঁর এই বীরত্বব্যঞ্জক দৃঢ় দেহটা বিরাট শূন্যের পাশে খুবই মহিমময় ভাবে ফুটে উঠেছিল।

মুহূর্ত্তের জন্য রসিদের মনে হল সে বুঝি একটা বিরাট নিদ্রার পর জেগে উঠেছে। এই নিদ্রার মধ্যেই যুদ্ধের অবসান হয়ে গেছে এবং সেই যুদ্ধের ভয়াবহ ঘটনার স্মৃতি স্বরূপ একটা সুন্দর মর্ম্মরমূর্ত্তি এই দুর্গম শৈলশিখরে নির্ম্মিত হয়েছে।

কিন্তু তার এ ধারণা বেশীক্ষণ রইল না। ঘোড়াটা একটু নড়ে উঠল, যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেইখানেই দাঁড়িয়ে সে সমস্ত শরীরটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নেড়ে নিলে। হঠাৎ রসিদের স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল। কি যে ব্যাপারটা সে বেশ বুঝতে পারলে। বন্দুকের কুঁদাটা সে বুকের উপর তুলে ধরলে, তারপর আস্তে আস্তে বন্দুকের নলটা ঝোপের বাইরে এনে আরোহী-যোদ্ধার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করলে। বন্দুকের ঘোড়া টিপা মাত্র বাকী; টিপলেই ব্যাস্! কিন্তু হঠাৎ আরোহী ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং যেন সেই ঝোপের ভিতর গুপ্ত কোন শত্রুর পানে তাকিয়ে রইল— রসিদের মুখ চোখ ভেদ করে বুঝি সে দৃষ্টি তার অন্তঃস্তলের ভিতর গিয়ে পৌঁছাল।

হত্যা! সে কি এতই ভীষণ? যুদ্ধের সময় শত্রুকে নিহত করা, সেটা কি এতই শক্ত? যে শত্রু তাদের এমন একটা গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করে যাচ্ছে যাতে তাদের সমস্ত দলের নিরাপদে থাকা একেবারেই অসম্ভব— অথচ তাহার হত্যায় তার হাত এত কাঁপে কেন? রসিদ থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, সে প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হয়ে সেইখানে

বসে পড়ল, হাতের বন্দুক খসে মাটীতে পড়ে গেল। সে অবসন্ন ভাবে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। তাকে তখন দেখলে কেহই বলত না এই সেই সমস্ত সৈন্যদলের মধ্যে সাহসী কর্ম্মঠ রসিদ বেগ, সে আজ হতবুদ্ধির মত নির্জ্জীব ভাবে রাস্তার পাশে পড়ে আছে।

(ঘ)

কিন্তু এ ভাব তার মুহূর্ত্তের মধ্যেই কেটে গেল। সে তৎক্ষণাৎ উঠে বসল। বন্দুকটা সে দুহাতে চেপে ধরলে, মাঝের আঙ্গুলটা তার ঘোড়ার উপর টিপে ধরলে। তখন তার মন, মাথা বেশ পরিষ্কার মনে হ'ল। সে বুঝতে পারলে, শত্রুকে জীবিত বন্দী করা অসম্ভব—অথচ তাকে একটু সাবধান করলেই সে সোজা ছুট দেবে নিজেদের আড্ডায়—গিয়েই যে সমস্ত খবর সে জেনে গেল, সেগুলা তাদের জানিয়ে দেবে। এ অবস্থায় সৈনিকের কর্ত্তব্য কি, এটা ঠিক করতে তার একটুও দেরী হ'ল না। তাকে আজ মরতেই হবে—একটুও না জানিয়ে নিতান্ত গুপ্ত ভাবে তাকে হত্যা করতেই হবে। কিন্তু—আবার একটা কিন্তু এসে মনটাকে তোলপাড় করে দিলে—তার মনে হ'ল, এও ত হ'তে পারে যে তাদের সংবাদ সে কিছুই জানে না—সেও হয়ত তারই মত প্রাকৃতিক দৃশ্যে মোহিত হয়ে কিছুক্ষণ এই সুন্দর মহান্ দৃশ্য উপভোগ করতে দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত সে যেখান থেকে এসেছে সেইখানে আপনিই ফিরে যাবে।

বন্দুক নামিয়ে রসিদ অপেক্ষা করতে লাগল, সে দেখতে চায় সে ফেরবার সময় কেমন ভাবে ফিরে।

রসিদ ফিরে একটু পিছিয়ে এল, তারপর সে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলে। মাঠের উপর কতকগুলি সৈনিক সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে,

আর তাদের ঘোড়াগুলাকে সাজ খুলে নদীর ধারেই ছেড়ে দিয়েছে; ঘোড়াগুলা নদীতে নেমে জল খাচ্চে। দেখেই বোধ হল ঘোড়াগুলা অনেকদূর থেকে এসে খুবই তৃষ্ণার্ত্ত হয়েছিল এখন টাটকা ঘাস ও ঠাণ্ডা জল পেয়ে যেন তারা বেঁচে গেল।

রসিদ নদীর ধার থেকে চোখ ফিরিয়ে অশ্ব এবং তার আরোহীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে। আবার সে তার বন্দুকটা তুলে ধরলে। এবার সে লক্ষ্য করলে অশ্বকে, তার মাথার ভিতর তখন কেবলই বাজছিল তার পিতার বিদায় বাণী—যাহাই কেন ঘটুক না সৈনিকের এক মাত্র লক্ষ্য কর্ত্তব্য।—কর্ত্তব্য! কর্ত্তব্য!! এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্ত চিত্ত চাঞ্চল্য স্থির হয়ে গেল—দাঁতের উপর দাত সে জোরে চেপে ধরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল—কর্ত্তব্য! কর্ত্তব্য!! তারই জয় হউক—তার সমস্ত দেহটা একবার মাত্র থর্ থর্ করে কেঁপে উঠে তারপর যেন অসাড় হয়ে গেল—তার চোখদুটা বুঝি আপনিই বুঁজে এল—অসাড় হাতে সে বন্দুকের ঘোড়া টিপে ধরলে—একটা ভীষণ আওয়াজ সমস্ত বনভূমিকে কাঁপিয়ে দিলে—তারপর যখন সে চোখ চাইলে তখন অশ্ব ও তার আরোহী পাহাড় থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

(৬)

জাতীয় দলের একজন সৈনিক বনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। ছোট পাহাড়ের ঠিক তলায় জঙ্গলের খানিকটা পরিষ্কার জায়গায় যখন সে এসে পৌছাল, ঠিক তার সামনে এক অদ্ভুত দৃশ্য, পাহাড়ের গায়ের উপর একটা প্রকাণ্ড বড় পাথর ঝুলছিল, আর সেই ভীষণ পাথরটার উপর একজন অশ্বারোহী দাঁড়িয়ে।

অশ্ব এবং অশ্বারোহীকে ঠিক সোজা তার মাথার উপর দাঁড়াতে দেখে তার মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল, তার হাত পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। সে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলে না, লম্বা সটান মাটীর উপর শুয়ে পড়ল সে চোখে আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না—তারপর একটা ভীষণ বন্দুকের আওয়াজে যখন তার জ্ঞান ফিরে এল, তখন সে মূর্ত্তিদ্বয় আকাশ-পট থেকে অদৃশ্য হয়েছে। সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল—তারপর পাছে আর কারও বা নজরে পড়ে এই ভয়ে ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে সে দৌড়াতে লাগল। মাঠটাক দৌড়ে এসে সে তাদের দলের লোককে খুঁজতে লাগল, কিন্তু কাহাকেও দেখতে পেলে না। সে যেন তাঁবুতে পৌঁছাবার বাকী রাস্তাটুকুও আর একেলা চলতে পারছিল না, তার প্রতি মুহূর্ত্তেই ভয় হচ্ছিল, হয়ত অশ্বারোহী নীচে নেমে এই পাহাড়ের ধারেই কোথাও অপেক্ষা করছে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে যখন সে তাঁবুতে পৌঁছাল, তখনই তাকে নিয়ে গিয়ে সেনাপতির সামনে হাজির করা হ'ল। তিনি তাকে পাহাড়ের মধ্যে কোনও রাস্তা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন; সে ভয়ে ভয়ে বলে ফেল্লে, "না হুজুর, এ পর্য্যন্ত আমার চোখে একটাও পড়েনি।"

একটাও আছে কিনা, সে খবরটা সৈনাধ্যক্ষ মহাশয় তার চেয়ে বেশ ভালই জানতেন। ঈষৎ হেঁসে তিনি তাকে বিদায় দিলেন। বেচারী সেনাপতির সামনে থেকে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

বন্দুকের আওয়াজের পর রসিদ বন্দুকটা পরিষ্কার করে, পুনরায় তাতে গুলি ভরে পাহারায় বসে ছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে গুঁড়ি মেরে একজন হাবিলদার তার পাশে এসে বসল। রসিদ দাঁড়িয়ে না উঠেই বসে বসে

তাকে অভিবাদন করলে। হাবিলদার তার অভিবাদন ফিরিয়ে দিয়ে বল্লে, "বন্দুক ছুঁড়েছিল কে, তুমি?"

রসিদ সেই ভাবেই বসে বসে বল্লে, "আজ্ঞে হাঁ।"

হাবিলদার পুনরায় জিজ্ঞাসা কর্লে, "ব্যাপারটা কি হয়েছিল?"

রসিদ উত্তর দিলে, "একটা ঘোড়া ঐ পাথরটার উপর দাঁড়িয়েছিল; আপনি দেখ্ছেন ত সেটা আর ওখানে নেই।" রসিদ তার মুখটা হাবিলদারের দিক থেকে ফিরিয়ে নিলে। তার মুখটা সাদা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার কথার ভাবে তার মনের অবস্থা কিছুই বুঝা গেল না।

হাবিলদার কিছু বুঝতে না পেরে বল্লে, "রসিদ বেগ, তোমার হেঁয়ালীটা এখন মুলতুবী রাখ—আমার হুকুম—বল সে ঘোড়ার উপর কোনও আরোহী ছিল কি না?"

রসিদ মৃদুস্বরে জবাব দিলে, "হাঁ, ছিল।"

গম্ভীরভাবে হাবিলদার জিজ্ঞাসা কর্লে, "কে?"

রসিদ স্থির ভাবে জবাব দিলে, "আমার বাবা।"

হাবিলদার বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল, শুধু তার মুখ থেকে অস্ফুট শব্দ হ'ল "ওঃ", তারপর আর কোনও কথা না বোলে যেমন নিঃশব্দে সে এসেছিল, তেমনি নীরবে সে নেমে গেল।

রসিদ বন্দুকটা কোলের উপর তুলে নিয়ে সাম্নের রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল—তার পাহারার সময় তখনও উত্তীর্ণ হয় নাই।

যৌবনের ভাঁটায়।

(১)

চা খেয়ে নীচে নেমে আসতেই দেখি, সকালের ডাক বিলি হয়ে গেছে। বেয়ারা টেবিলের উপর সেগুলা রেখে গেছে। প্রথমটা খুলে দেখি এক মক্কেল লিখেছেন আজ তাঁর মোকর্দ্দমার দিন, কিন্তু বিশেষ কারণে তিনি হাজির হতে পার্ব্বেন না, কোনও রকমে আজ যেন মোকদ্দমাটী মুলতুবী কর্ব্বার চেষ্টা করি। ভালই; উকিলদের পক্ষে সুখবর। দ্বিতীয় চিঠিতে একজন এটর্নী মহাশয় জানিয়েছেন, সেদিন পলাশডাঙ্গার বাবুদের যে ব্রীফ্‌টা তিনি আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন, সেটা আমার দেখা হয়েছে কিনা; আজ তাঁরা ওপিনিয়ন নিতে আসবেন, কোর্টের পর যেন তাঁর অফিসে যাই। তার পরের খানা বার লাইব্রেরী থেকে, চীফ্‌ জষ্টিস্‌কে ষ্টীমার পার্টি দেওয়া হবে, শনিবার দিন বৈকালে ৩টায়, তার নিমন্ত্রণ পত্র। এ খবরটাও মন্দ নয়। তার পরের চিঠিখানা Bank (ব্যাঙ্ক) থেকে, তাঁরা দুঃখের সহিত জানাচ্চেন যে tea-এর যে share (চায়ের সেয়ার) গুলা তাঁরা আমায় কিনিয়ে দিয়েছিলেন, বাজারে তার দর ১৲ টাকা এর মধ্যেই নেমে গিয়েছে, ভবিষ্যতে আরও নামতে পারে; এখন সেগুলা বেচতে পার্লে কিছু পাওয়া যায়। আমি বেচতে ইচ্ছুক কি না; তা হ'লে তাঁরা সেগুলা বেচবার চেষ্টা কর্ব্বেন। যাক্‌ কিছু

লোকসান সকালেই হ'ল। তার পরের চিঠিটা, কোথা থেকে, কে লিখেছে বুঝতে পারলুম না; হস্তাক্ষর সম্পূর্ণ অপরিচিত। খুলে দেখি; বাঃ, এ যে আমায় বেশ আশ্চর্য্য করে দিলে।

চিঠিতে লেখা ছিল—"সমীর বাবু, আপনি বোধ হয় ডলীকে ভুলেন নাই; যদিও আজ ১৯২০ বৎসর পূর্ব্বে সে আপনার বিশেষ পরিচিত ছিল। যদি না ভুলে থাকেন ত বৃহস্পতিবার বৈকাল ৪টার সময় নীচের ঠিকানায় আমার সঙ্গে দেখা করলে বিশেষ সুখী হব। এইখানেই চা খাবেন। ইতি লীলা বোস।—নং, ল্যান্স ডাউন রোড। কলিকাতা।"

ডলী! ডলী!! উঃ, আজ বিশ বৎসর পরে ডলীর প্রথম পত্র পেলাম। ডলী! সে আমার পরিচিত বন্ধু! শুধু পরিচিত? একদিন তাকে আমার জীবন যাত্রার পথের বন্ধু করবার কতই না ইচ্ছা করেছিলাম সব ঠিকও ছিল, কিন্তু হ'ল না, সেটা আমার দোষে নয়, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায়।

এই ডলীই বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার মনের সবখানটাই জুড়ে ছিল, এবং তারও যে আমায় বিশেষ অপছন্দ ছিল তাও মনে হ'ত না, বরং আমাকে তার ভালই লেগেছিল। আমাদের সম্বন্ধটা আমাদের সমাজের সকলেই বেশ জানতেন। ঠিক ছিল বিলাত থেকে এলেই আমাদের বিবাহ হবে। ডলীও দু বছর অপেক্ষা করতে রাজী ছিল। তারপর বিলাতেই খবর পেলাম সে একজন সিভিলিয়ানকে বিয়ে করে পঞ্জাবের ওধারে চলে গেছে। সে আমায় কোনও খবরই দেয় নাই; দিয়েছিল আমার বোন স্নেহ। মনটা বেশ দমে গেল। শীঘ্র দেশে ফেরবার উৎসাহটা কমে গেল। কয়েক বছর Continent (কন্টিনেন্ট), America (আমেরিকা) প্রভৃতি খুব ঘুরে বেড়ালাম। তখন ডলীদের কিছুই খবর রাখ

নাই। তারপর এসে practice (প্র্যাকটিস্) সুরু করেছি সেও প্রায় আজ ১৫ বৎসর পূর্ব্বে; ডলীর কোনও চিঠি এ পর্য্যন্ত পাই নাই, তবে জান্তাম তারা সুদূর পশ্চিমেই আছে, এই পর্য্যন্ত।

(২)

বৃহস্পতিবার—সকাল সকাল কোর্ট থেকে বেরিয়ে বরাবর ডলীদের বাড়ী পৌঁছালাম। বেহারার হাতে কার্ড পাঠাবার কিছুক্ষণ পরে একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে আমায় অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেলেন। তাঁর চুলগুলা সব প্রায় পেকে এসেছে; মুখের চামড়া বেশ কুঞ্চিত, বয়স ৪৪ এর কম মোটেই নয়। আমি অপরিচিতের মত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে তিনি হেঁসে বল্লেন, "কি সমীর বাবু, চিন্তে পারছেন না? আমি ডলী।"

"আপনি—তুমি ডলী!"

"হ্যাঁ—আশ্চর্য্য হচ্ছেন যে?"

আশ্চর্য্য? আমি যে কি হচ্ছি, তা আমি নিজেই বুঝতে পার্‌ছি না। এই ডলী—এর চুলগুলা বয়সের তাপে ঝলসে শাদা হয়ে গেছে; অঙ্গ শিথিল হয়ে গেছে, চোখের কোনের চামড়া ঝুলে পড়েছে, এই বৃদ্ধা বলে কি না "আমি ডলী" ইচ্ছা হচ্ছে ওর টুঁটী টিপে ধরে বলি, "তুই মিথ্যাবাদী, ঠক্; ডলীর নাম নিয়ে আমার সঙ্গে ছলনা করতে এসেছিস।" আমি চুপ করে আছি দেখে সেই বল্‌তে লাগল, "কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? তা না হবারই কথা প্রায় বিশ বচ্ছর দেখাশুনা নাই ত। তা ছাড়া চেহারারও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে।"

আমি একটু থতমত খেয়ে জবাব দিলাম, "হাঁ তা প্রথম একটু— তুমি ত খুবই বদলে গিয়েছ। আমি তোমায় যে রকম দেখে গিয়েছিলুম তার চেয়ে তুমি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছ।"

"তুমি যখন বিলাত যাও তখন আমার বয়স ১৯; সেবার আমি ফাষ্ট আর্টস্ দিই। তারপর এখন আমার বয়স ৪০ এর কাছাকাছি; বুড়ী হয়ে গেলুম, চেহারা বদলাবে না? আমাদের দেশে একটা চলিত কথা আছে জানত, যে বাঙ্গালীর মেয়েরা কুড়ী পেরুলেই বুড়ী হয়, আমিত কুড়ী দুগুনে চাল্লিশ পার হতে চল্লুম।"

"বুড়ী? চাল্লিশ পার হলেই বুঝি বুড়া হ'তে হয়? তা হলে তুমি আমাকেও বুড়োর দলেই ফেলতে চাও? জান, আমি নিজেকে এখনকার যুবকদের চেয়েও নবীন মনে করি। তা হলেও আমাকে তুমি নবীন যুবকদের মধ্যে একজন ধরে নিতে পার।"

ডলী হেঁসে বল্লে, "তোমার কথা আলাদা, বিয়ে করনি তুমিত নিজেকে নবীন যুবক মনে কর্ব্বে। যাক্, আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেই। ঝি, তোমার দিদিমণিকে ডেকে দেও ত'। চা-টাও তাকে নিয়ে আসতে বোলো।"

অল্পক্ষণ পরেই একটী ১৭।১৮ বচ্ছরের মেয়ে 'বয়ে'র হাতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকল। দেখেই আমি চমকে উঠলাম; একি, এ ডলী, না তার প্রতিচ্ছবি? কে বলবে এ ডলী নয়? এয়ে আমারই ডলী আজ বিশ বৎসর পরে আবার আমার কাছে ফিরে এসেছে, যেমন সে আগে আসত, ঠিক এমনি করে 'বয়ে'র হাতে চা নিয়ে। বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠ্‌ছে। বোধ হ'ল মেয়েটী হাত তুলে আমায় নমস্কার

কচ্ছে, কিন্তু আমার সকল অঙ্গ তখন অসাড় হয়ে গেছে। নমস্কার ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি। অভিভূতের মত চেয়ারের উপর চুপ করে বসে রইলাম।

চমক ভাঙ্গল লীলার ডাকে (না, আর ওকে ডলী বলে ডাকব না, ও ত আমার ডলী নয়, এ লীলা দেবী) "সমীর, এই আমার মেয়ে ধীরা; এবার লাহোর কলেজ থেকে I. A. (আই-এ) দিয়াছে; ধীরা, ইনি মিঃ সেন, সমীর সেন ব্যারিষ্টার-এট্-ল।" ধীরা পুনরায় আমায় ছোট্ট একটী নমস্কার কর্লে; ভদ্রতার খাতিরে আমিও নমস্কার ফিরিয়ে দিলাম। তার পর আর আমি তেমন আলাপ জমাতে পারলুম না, গলা যেন আমার কে চেপে ধরেছিল। মার হুকুমে ধীরা আমায় শোনাবার জন্য গান গাইলে তার গলার স্বর মনে হ'ল ঠিক যেন ডলীর মত, বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে স্বর আমি শুনতাম, তার সুর এখনও আমার কানে বাজছে, সে সুর কি আমি ভুলতে পারি? এ ঠিক সেই সুর। নাঃ, বড্ড গরম লাগছে, বাহিরে যেতে হবে; ভিতরটা হাঁপিয়ে উঠেছে, মুক্ত বাতাস চাই।

কোনও রকম করে বিদায় নিলাম। লীলা আমায় এগিয়ে দেবার জন্য বেরিয়ে এল। আসতে আসতে বলতে লাগল, "জান সমীর, আমরা থাকি কোন্ বিদেশে পড়ে, সেখানে বাঙ্গালী নাই আর থাকলেও এমন কেউ নাই যার সঙ্গে ধীরার বিয়ে ঠিক করতে পারি। অথচ বিয়ে আমি এখান দিতে চাই। এর চেয়ে বেশী বড় করে রাখতে আর আমি চাই না, আর ওর বিয়ের জন্যই আমার কলিকাতায় আসা। এখানেও আমার বিশেষ জানাশুনা আর কেউ নাই; আগের যাদের জানতাম, তারা কে কোথা ছিটকে পড়েছে কিছুই জানি না। তুমিই আমাদের একমাত্র

ভরসা! এদিকের সব ঠিক-ঠাক হয়ে গেলেই তিনি আসবেন দিন কতকের ছুটী নিয়ে! এ বিষয়ে তোমায় একটু চেষ্টা করতে হবে; এটা আমার বিশেষ অনুরোধ।"

মাত্র ঘাড় নেড়ে জবাব দিয়ে বাহিরে বেরিয়ে এলাম।

তারপর মাথাটা একটু বাহিরের হাওয়ায় ঠিক করে নেবার জন্য সোজা গঙ্গার ধারে চলে গেলাম।

"এই ত আমার ডলী, এই ত আমার হারানধনকে আমি ফিরে পেয়েছি। ওটা বলে কিনা আমি ডলীর বুড়া! জোচ্চর!! পরের নামে নিজেকে চালাতে চাস্। হুঁ, আমার সঙ্গে চালাকী, আমি যেন ডলীকে চিনি না। আমার এ্যালবামখানা ভর্ত্তি হয়ে রয়েছে ডলীর ছবিতে আর সেগুলা আমি নিজের হাতে তুলেছি। আমায় এসেছে ডলী বলে ভুলাতে?—হ্যাঁ! আমার উপর ভার দিয়েছে ওর বিয়ের সম্বন্ধ করতে। আরে সম্বন্ধ ত ঠিকই আছে। আজ প্রায় ২০।২১ বৎসর ডলীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঠিক হয়ে আছে, পৃথিবী শুদ্ধ লোক সবাই জানে আর উনি জানেন না? আমায় বোকা বুঝাতে এসেছেন। যা হোক্, কাল সকালেই গিয়ে বলব 'মিসেস্ বোস, আমার সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ আগে থেকেই স্থির করা আছে।' ব্যাস—"

অনেকদিন পরে আজ আরসীর সামনে দাঁড়িয়েছি। এখনি মিসেস বোসের সঙ্গে দেখা করতে হবে তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ ঠিক করতে।

কিন্তু একি, আয়নায় এ কার চেহারা? আমার? না—না—আমার কেন হবে? এযে দেখ্‌ছি অপর কার চেহারা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এর যে কাল চুলের ফাঁকে ফাঁকে শাদা চুল দেখা যাচ্ছে। এর চোখের কোণটা এত কোঁচকান কেন? এটা কে—এটা কে? আমি! —আমি—আঁ!! তা হ'লে লীলার কথা সব সত্যি? সে যা বল্লে আমি তাই—আমি বুড়ো? উঃ—!

মাথাটা ঘুরে উঠল, কোটটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেয়ারটার উপর বসে পড়লাম।